বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : শিক্ষা ও শিক্ষিত

গঙ্গা শোধন প্রকল্প : স্বনির্ভরতা কোথায়

তেল কেলেঙ্কারীর এক বছর

মৃত্যু-মিছিল : সিলিকোসিস

গণবিজ্ঞান : সম্মেলন ও বিতর্ক

মন্দিরবাজার : পরিবেশ আন্দোলন

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত——ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা □ জুলাই-আগস্ট 1989——দাম দু'টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জুলাই-আগস্ট 1989 □ ত্রয়োদশ বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : শিক্ষা ও শিক্ষিত
□ সৌমেন গুহ

9 গঙ্গা শোধন প্রকল্প : প্রযুক্তি নির্বাচন ও স্বনির্ভরতা
□ (সংকলন) সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায়

11 বেহালা : তেল কেলেঙ্কারীর এক বছর
□ উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

13 সিলিকোসিস : মৃত্যু-মিছিল
□ (সংকলন) শান্তনু ত্রিবেদী

15 বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা : সাধারণ সভা
□ পূরবী ঘোষ

16 [বিবিধ]
□ শান্তনু ত্রিবেদী ও সুদীপ্ত সরস্বতী

18 গণবিজ্ঞান সম্মেলন : কল্যাণী
□ বি-ও-বি'র অংশগ্রহণকারী দল

22 মন্দিরবাজার : আন্দোলন ও তারপর
□ দিলীপ বৈদ্য

23 তেজস্ক্রিয় ছড়া
□ নিশীথ চৌধুরী

24 চিঠিপত্র
□ সুব্রত ভট্টাচার্য, সৌমেন গুহ

তৃতীয় প্রচ্ছদ
রণজিৎ : 'স্মৃতির ফুল'

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী □ B2 বৈশাখী □ 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074 (ফোন 59-6357) □

পড়ুন ও পড়ান

□ **বিজ্ঞান শিক্ষা : প্রাথমিক হালচাল**

□ **না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না**

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা।

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
B2 বৈশাখী, 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' কোথায় পাবেন :

□ বুকমার্ক—কলেজ স্কোয়ারের পিছনে (মনীষার পাশে)
□ কথাশিল্প—কলেজ স্ট্রীট
□ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
□ 'রাণার দোকান'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে।
□ মহীন্দর, মহেন্দ্র মণ্ডল, শম্ভু মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাথের স্টলগুলো)
□ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (CESC-এর বিপরীত ফুটপাথে)
□ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের দোকানের পাশে)
□ 'উৎস মানুষ'-এর অফিস—2 রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9 (এন-বি-সি'র উল্টোদিকে)
□ দমদম স্টেশন—(1নং ও 2নং প্লাটফর্মের স্টলগুলো)
□ শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুকস্টল, ও ব্যারাকপুর স্টেশনের স্টল

এ ছাড়াও খোঁজ করুন :

□ রবীন চক্রবর্তী—অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ।
□ বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত—বালিগঞ্জ পোস্ট অফিস (বিড়লা মন্দিরের বিপরীতে)।

সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : শিক্ষা ও শিক্ষিত

সৌমেন গুহ

ধাঁধা

আধুনিক অভিধানে দেখি 'idiot' শব্দটির অর্থ 'মূর্খ' (fool ; a person suffering severe mental handicap and incapable of rational conduct)। এ শব্দটির মূল উৎস প্রাচীন গ্রীক 'ইদিয়োতেস্' বলতে কাদের বোঝাতো ?

উত্তর : 'ইদিয়োতেস্' অর্থ সাধারণ মানুষ ; বিশেষ লেখাপড়া না-জানা মানুষ [দ্রষ্টব্য : **A Greek-English Lexicon to the New Testament**, Samuel Bagster, London, 23rd. edn.]।

শিক্ষা ও শিক্ষিত

"I only took the regular course."

"What was that ?" inquired Alice.

"Reeling and Writing, of course, to begin with," the Mock Turtle replied ; "and then the different branches of Arithmetic—Ambition, Distraction, Uglification, and Derision."

[বর্তমান নিবন্ধে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ মূলত বাদ দেয়া হয়েছে—পরবর্তী নিবন্ধে আলোচনা করা হবে বলে। শিক্ষা ও শিক্ষিতের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমান অংশীদার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা—কিন্তু অবশ্যই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী একটি বিশেষ সামাজিক আর্থনীতিক অংশ হিসেবে ক্রিয়া করে বলে, বর্তমান লেখকের বিশ্বাস। এই অংশ বা উপ-শ্রেণীর মধ্যে গণিতবিদ্দের ফেলতেও বর্তমান লেখক নারাজ—যদিও গণিতবিদ্‌রা কখনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের উপ-শ্রেণীর সুবিধে ভোগ করে থাকে !]

অতি আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা অবশ্য 'ইন্টেলিজেন্সিয়া' ও 'ইন্টেলেক্চুয়াল' আলাদা চোখে দেখেছে। পরীক্ষা পাশের ছাপ আছে, এরা সবাই 'ইন্টেলিজেন্সিয়া'। আর শিক্ষালয়, সাহিত্যে, শিল্পে যারা পেশাদার বা জীবিকা নির্বাহকারী, বা প্রতিষ্ঠিত—এরা 'ইন্টেলেকচুয়াল'। আমরা অবশ্য বর্তমান নিবন্ধে মূলত 'ইন্টেলেকচুয়াল'-দেরকে শিক্ষিত বলছি—কিন্তু পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববিদ্দের গুরুত্বপূর্ণ উপ-শ্রেণীবিভাগকে ঈষৎ রাষ্ট্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার সাথে খাপ-খাইয়ে। বা, বলা যায় অত্যন্ত ব্যবহারিক ব্যাখ্যা করে।

বলতে চাইছি—ইন্টেলেকচুয়ালদের অতি নগণ্য অংশই থাকে শিক্ষালয়গত শিক্ষাপ্রাপ্তির বাইরে। আর ইন্টেলেকচুয়ালদের বিরাট অংশই 'ডিপ্লোমা এলিট্', যার একাংশ 'পাওয়ার এলিট্'দের অন্তর্গত।

তাই এ নিবন্ধের আলোচনা ইন্টেলিজেন্সিয়ার এক সফল অংশকে নিয়ে, যারা ইন্টেলেকচুয়াল হতে পেরেছে—'এলিট্' সম্প্রদায়ে যার অধিকতর সাফল্য আর 'পাওয়ার এলিট্' হলে যাদের চরম সাফল্য। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এরা শিক্ষালয় থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তাই শিক্ষা বলতে এ নিবন্ধে শিক্ষালয়জাত রহস্যবিদ্যাকেই বোঝানো হয়েছে। আর শিক্ষিত বলতে শিক্ষালয়জাত রহস্যবিদ্দের ধরা হয়েছে। এর অবশ্যই সব থেকে গুরুতর কারণটি ভিন্ন। সেটি হলো—

পরিসংখ্যানগত গুণমান বা attribute দিয়ে শিক্ষাকে বিচার করার এখনও পর্যন্ত মাপকাঠি—শিক্ষালয়জাত, শিক্ষালয়ভৃত, শিক্ষালয়গত, শিক্ষালয়াঙ্গী পরীক্ষা-ছাত্র-পাশ-ফেল-ডিগ্রী-নম্বর ইত্যাদি। আর কোনো পথ খোলা নেই শিক্ষিতদের মাপার, শিক্ষাকে মাপার।

যদিও অজস্র-সহস্র বাক্যবাণে আমাদেরকে বলা হয়েছে—বিদ্যা-পাণ্ডিত্য-জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু অমৃতের সন্তানদের, যাদের ভবিতব্য সমাজের এলিট শ্রেণীর আলোকোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য মঞ্চে, তাদেরকে বলা হয়েছে—নান্য পন্থা বিদ্যতেহ্‌নায়। আর কোনো পথ নেই। অমৃতের সন্তানরা চালাকিটা আবার শিখে ফেলে—নতুনদের তারা বোঝায় বিদ্যা-পাণ্ডিত্য-জ্ঞান ! নিজেরা এরা সতর্ক। সতর্ক হয়েই অমৃতের সমার্থক বলে এরা যা খুঁজেছে, যা ব্যবহার করেছে—তাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে 'শিক্ষা' বলে সুকৌশলে চালিয়েছে। অবশ্যই আমাদের বা অন্য দেশে পাণ্ডিত্যের মন্ত্রী, বা জ্ঞান-বাজেট, বা বিদ্যা-কমিশন থাকে না। যা থাকে তা হলো—শিক্ষা-মন্ত্রী, শিক্ষা-বাজেট, শিক্ষা-কমিশন ইত্যাদি। যাদের সবারই লক্ষ্য স্কুল, কলেজ ইত্যাদির হালচাল দেখ্‌ভাল করা।

আবারও বলছি, শিক্ষিত বলতে এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটির মধ্যে দিয়ে তৈরী অংশকে বোঝাচ্ছি—কারণ, এ ছাড়া আজও কোনো পরিসংখ্যান করা সম্ভব নয়।[1]

স্কুল-কলেজ ইত্যাদি আমাদের 'শিক্ষালয়', পাশ করার পাঠক্রম হলো 'শিক্ষা'—আর পাশ যারা করেছে তারা আমাদের 'শিক্ষিত'। এটা সরকারী নয় শুধু—তাবৎ প্রগতিশীলরা বা যারা 'শিক্ষা-আন্দোলন' করছে, সবাই মানে। শুধু ঈষৎ বেকায়দায় পড়লে—মহৎ কথা বা ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়।[2]

"বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সঙ্কট হলো কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রমে সমতার অনুপস্থিতি।" সর্বভারতীয় এক সংগঠন লিখছে 1978 সালে ![3]

'Society for Democratisation of Education' সংস্থা 1981 সালে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে' শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ বলতে স্কুল, কলেজ, য়ুনিভার্সিটির ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছে এবং রাজ্য সরকারের সমর্থনে।[4] আবার 1987 সালে সরকারবিরোধী এক ছাত্র সংগঠন ওই নির্বাচনের লক্ষ্যে লিখছে—"যে পরিমাণে আজকের

সমাজব্যবস্থা জনবিমুখ, ঠিক সেই পরিমাণেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র স্বার্থের পরিপন্থী।"[5] শিক্ষার সাথে ছাত্রের সম্পর্ক, বা ছাত্রস্বার্থের সম্পর্ক —সংগঠনটির আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। জনগণ বাদ।

কিন্তু শিক্ষকরা অতো বোকা নয়। অতএব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সমিতি লিখলো 1986 সালে—"বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝায় তরুণদের ভবিষ্যৎ, দেশের গড়ে ওঠা, সমাজের গতি নির্দেশ হওয়া, মানুষের মুক্তি।"[6] কী প্রয়োজনে জানি না—কিন্তু এরাও 'ক্লাস কমে যাওয়া', 'দুই শতাধিক শূন্য শিক্ষকপদ' ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান রেখেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়—ছাত্র-শিক্ষক মায় বেশ কিছু বাইরের মানুষকে ভাবিয়ে তোলা হচ্ছে—শিক্ষালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাটির কিছু সংস্কার করা প্রয়োজন।[7] কারণ সেখান থেকেই শিক্ষা ও শিক্ষিতরা উৎপাদিত হয়। এরা কেউই বলছে না—সমগ্র শিক্ষার ইতিহাসে লালিত এই কাঠামো কোনোভাবেই দার্শনিক বা ভাবালুতার অর্থে শিক্ষা ও শিক্ষিত বার করতে পারে না। ক্রমবর্ধমান প্রচার ও পরিকল্পনা শিক্ষায়তনগত 'শিক্ষা ও শিক্ষিত' ধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিচারবুদ্ধিটুকু কেড়ে নিচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধে এই 'শিক্ষা ও শিক্ষিত' statistical attribute-টিকে সরাসরিভাবে শিল্প-রাষ্ট্র-প্রশাসন-আমলাযন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের অঙ্গ হিসেবে দেখা হবে।

শিক্ষার ছাপ

……the Cat went on, "you see, a dog growls when it's angry, and wags its tail when it's pleased. Now, I growl when I'm pleased and wag my tail when I'm angry. Therefore I'm mad."

কথায় বলে—'শিক্ষিত চাল চলন'/'শিক্ষিত চেহারা' ইত্যাদি। বর্ণ-বিদ্বেষ বা আর্যরক্তের অহমিকার মতো—সমাজে শিক্ষিতদের চেনার গোটাকয়েক বর্ণ-রক্ত-মুখের আদল থেকে শুরু করে চলন-বলন-ঢং ঠিক করে দেয়া আছে। যেগুলো, অশিক্ষিতদের বিপরীত। যেমন :

1. যদি জানা যায় ক'টা পাশ, বা উচ্চমর্যাদায় চাকুরী আছে, তবে অবশ্যই শিক্ষিত। জেনে ফেললে মিটে গেলো। না জানা থাকলে—শিক্ষিতরাই কথায় বা ব্যাগের পৃষ্ঠে এটা প্রচার করে।
2. শিক্ষিতরা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সহিষ্ণু। এমনকি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে—অশিক্ষিতদের থেকে দ্বিগুণসংখ্যক শিক্ষিতরা পুলিশকে 'ভালো' বলছে।[8]
3. শিক্ষিতরা একটি বিশেষ উপভাষায় কথা বলে। এটা অভিজাত ভাষা। কালিদাস বা শেক্সপীয়ারের সাহিত্যের চরিত্রদের মুখে নানা উপভাষা—সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী![9] আর এই অভিজাতভাষার উদ্ভব সংখ্যালঘুদের হাতে—যেমন, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতভাষা বা আধুনিক ভারতের কৃত্রিম রাষ্ট্রভাষা হিন্দী।[10]
4. শিক্ষিতদের, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদির স্নাতক, স্নাতকোত্তর, স্নাতকোত্তরোত্তর…পাশ করতে হলেও—বস্তি, জনগণ, গ্রাম, ভিখারী, বা সামাজিক কোনো বিত্তহীনদের সম্পর্কেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করতে বা আলোচনা করতে দীর্ঘ ট্রেনিং বা কোর্স দরকার হয় না।
5. কিন্তু—সামাজিক বিত্তহীন শ্রেণীর যে কোনো বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার স্বাধীনতা ভোগ করলেও, শিক্ষিতরা অপর শিক্ষিতদের শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সতর্ক। এটার চালু কথ্যভঙ্গী—'আমি এ সাব্জেক্টের লোক নয়!' অর্থাৎ, নিশ্চয় ঐ 'সাব্জেক্ট' শিক্ষালয়গত শিক্ষার বস্তু।
6. শিক্ষিতরা—মারদাঙ্গা করে না, মুখখিস্তি করে না, অবিন্যস্ত ও ময়লা চেহারায় থাকে না, কুলি-মজুর-চাষীদের মতো পোষাক পরে না, বিশেষ রীতিতে ওঠে-বসে-চলে, ইত্যাদি—সর্বোপরি, শারীরিক মেহনত করার কাজ করে না।
7. শিক্ষিতদের পরিবারের, উপশ্রেণীর ভেতরের খবর বাইরে প্রকাশ পায় না।

পাণ্ডিত্য : $\frac{a+b^n}{n}=x$

"Would you tell me," said Alice, a little timidly : "why you are painting those roses ?"

…"Why, the fact is, you see, Miss, this here ought to have been a *red* rose-tree, and we put a white one in by mistake ; and if the Queen was to find it out, we should have our heads cut off, you know…"

সন্দেহ হয়—শিক্ষিতের সাথে পণ্ডিতদের গুলিয়ে ফেলছে এ নিবন্ধের লেখক! পাণ্ডিত্য হলো একটা মূল্য-মুক্ত বস্তু, এমন একটা প্রচার আছে। পাণ্ডিত্য কাকে বলে? অন্ততপক্ষে বলা যায়—'গভীরভাবে' (বা কঠিনভাবে?) ভাবনা হলো পাণ্ডিত্য। অনেকে বলে—অমুকের পাণ্ডিত্যটা অস্বীকার করা যায় না! আর আমার কাছে সেটাই সব থেকে বড়ো বিপদ। শিক্ষিতরাই পণ্ডিত, বা শিক্ষিতদের একাংশ পণ্ডিত। শিক্ষাই পাণ্ডিত্য, বা শিক্ষার একটি রূপ পাণ্ডিত্য। আর পাণ্ডিত্য হলো এই শিক্ষিতদের, সম্ভবত, সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র—অশিক্ষিত বৃহদাংশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার, ক্ষমতা বজায় রাখার। এটার বাজার দর অতি উচ্চ—বড়ো বড়ো রাজারা তাই সভায় 'রত্ন' রাখতো, বড়ো বড়ো রাজনীতিক ক্ষমতাগোষ্ঠী এগুলো ভালো পয়সা দিয়ে কেনে। এবং—শিক্ষালয়গত পরম্পরায় দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারীরা এই পাণ্ডিত্যামৃতের স্বাদ গ্রহণ করে অমৃতের সন্তান হয়ে ওঠে।

1727 সালে প্রায়-কিংবদন্তী সুইস গণিতবিদ্ এ্যলের (Leonard Euler) রাশিয়ায় গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলো। এ সময়কালে সমগ্র য়ুরোপে নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের প্রচার ও প্রসারের অসীম শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলো দিদেরো (Diderot)। একবার রাশিয়ার

রাজসভায় আহূত দিদেরোর বিরুদ্ধে এ্যলেরকে হাজির করলো রুশ-রাজ-মহিষী জারিনা। জারিনা দিদেরোর নিরীশ্বরবাদের প্রচার ও প্রসার চাইতো না। অঙ্ক কষে এ্যলের প্রমাণ করবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সরল, দিদেরো বিশ্বাস করলো। এ্যলের বললো—'মহাশয়, $\frac{a+b^n}{n}=x$, অতএব ঈশ্বর আছে। জবাব দিন।' দিদেরোর কাছে অঙ্ক দুর্বোধ্য। সবাই হেসে উঠলো। দিদেরো তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলো![11]

উপরোক্ত ঘটনায় 'পাণ্ডিত্যের চরিত্র' এরকম : খুব কম লোকে বোঝে এমন জটিল কায়দায় উপস্থাপন ; নিজের বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করা ; প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অর্থহীন বা উল্টো জিনিস প্রমাণ করার কাজে এটাকে লাগানো।

তথাকথিত সাহিত্যের জন্মের ইতিহাসেও জটিলতাকে পাণ্ডিত্য হিসেবে তারিফ করা হয়। বিপরীতে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আবার পণ্ডিতরাই প্রস্তুত। আর 'ইদিয়োতেস্' যারা—তারা এ পাণ্ডিত্যকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারী নয়।

যদিও শাস্ত্রের সমর্থন খুব পাওয়া যায় নি—তবুও, বিশেষত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের শেষের 'আরোহন্ত জনয়ঃ যোনিমগ্রে' শব্দাবলীকে সতীদাহের সমর্থনে ব্যবহার করা হতো। কে তর্ক করবে? অবশেষে গত শতকের প্রতি-পণ্ডিতরা ভুলটাকে ধরাবার চেষ্টা করলো। সতীদাহের সমর্থকরা 'যোনিমগ্রে'-র 'অগ্রে' শব্দটির বদলে বসালো 'অগ্নে'! প্রতি-পণ্ডিতরা এটাকেও নগ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করলো। একটা শব্দের প্যাঁচে—শত শত নারীকে সতীদাহ বা সহমরণের নামে হত্যার বন্দোবস্ত—পাণ্ডিত্যেরই অবদান।

"আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভুরি ভুরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্যটি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।"

শিক্ষা-পিরামিডের মাথায় কায়দা করে চেপে বসতে পারলে, 'পণ্ডিত' আখ্যাটি একবার লাভ করতে পারলে—তারপর প্রায় রাজনীতিক পিরামিডের শিখরে বসে বাণী বা হুকুম দেয়ার ক্ষমতা এসে যায়।[12] অবশ্যই এ শিক্ষা, বা পাণ্ডিত্যের পিরামিডের শিখরাঞ্চল সংরক্ষিত থাকে প্রধানত রাজা বা শাসকের তাঁবেদারদের জন্যে।[13]

প্রাচীন গ্রীসে পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ আনে—স্বাধীনতার বিশ্বাসঘাতকদের সাথে বন্ধুত্বের (অভিযোগ ছিলো একাধিক)।[14] প্লেটো ছিলো দ্বিতীয় ডিওনাইসিয়াসের শিক্ষক—যার জন্যে প্লেটোকে বিপদে পড়তে হয়।[15] এশিয়া মাইনরের ক্ষমতার লোভী আলেক্সাণ্ডারের একান্ত শিক্ষক ছিলো অ্যারিস্টট্‌ল্—যার জন্যে নিজের দেশে সে ক্ষোভ ও রোষের লক্ষ্য হয়েছিলো।[16] এ ভাবে গড়ে উঠেছে চরম শাসকপ্রিয় পণ্ডিতদের হাতে—আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। এর অন্যথায়—মুছে যাবে অস্তিত্ব। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে পোল্যাণ্ডের যে গণিতবিদ মননের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো—সেই স্তানিস্লাভ্ স্যাক্স্ (Stanislaw Saks) মাত্র 45 বছর বয়সে, 1942 সালে ভার্সভের কারাগারে মৃত্যু-বরণ করে।[17]

শিক্ষালয় : ক্যান্টনমেন্ট ও সেনাদল

"When we were little,……we went to school in the sea. The master was an old Turtle—we used to call him Tortoise—"

"Why did you call him Tortoise, if he wasn't one?" Alice asked. "We called him Tortoise because he taught us," said the Mock Turtle angrily : "really you are very dull!"

পাণিনি-পূর্ব প্রাচীন ভারতীয় শব্দকোষে 'শিক্ষা' এই সংস্কৃত শব্দটির 'প্রদান করা' অর্থ করা হয়েছে। আবার প্রাচীনকালেই (যদিও সময়াঙ্ক খুব নির্দিষ্ট নয়) 'শিক্ষা' বলতে প্রায়-phonetics শাখাকে বোঝানো হতো। কাজেই কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' শিক্ষা বলতে education নয়—phonetics-কে বোঝানো হয়েছে।[18] তখন 'অধ্যয়ন' ও 'অধ্যাপনা' শব্দ দু'টি ব্রাহ্মণদেরই স্বধর্ম, ঠিক করা হোলো। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও 'অধ্যয়ন' করবে কিন্তু শূদ্ররা করবে না! ক্ষত্রিয়রা রাজা, বৈশ্যরা ব্যবসায়ী—এরা হবে শিক্ষিত, নানা শাস্ত্রে (বেদ ও বেদাঙ্গে)। এদের শিক্ষক হবে—ব্রাহ্মণরা। শূদ্রদের কাজ হলো—এতাবৎ শিক্ষিত ও শিক্ষকদের সেবা করা।[19]

'অর্থশাস্ত্র' বিন্যেস করে, রাজার ছেলে কেমন করে অধ্যয়ন করবে—তার ফিরিস্তি দিয়েছে। এই হলো চিরায়ত হিন্দু শিক্ষার ঐতিহ্য! বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ঈষৎ উদারনীতি থাকলেও—একই শ্রেণীর—অর্থাৎ, রাজা বা শ্রেষ্ঠীর পুত্রদের জন্যে শিক্ষা বরাদ্দ।[20] গ্রীসের মতো না হলেও—প্রাচীন ভারতে শ্রেণী হিসেবে দাসদের উপস্থিতি ছিলো। শূদ্র বা দাস, বা নিম্নশ্রেণীর অক্লান্ত শ্রমে ও তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠনে—গড়ে উঠেছিলো শিক্ষা ও শিক্ষিত।

শিক্ষালয়কেন্দ্রিক যে পশ্চিমী ব্যবস্থা, তার উৎস প্রাচীন গ্রীসের 'অ্যাকাডেমী'—প্লেটো যার উদ্গাতা। সম্ভবত, 388 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠা।[21] প্লেটোর স্বপ্ন ছিলো 'দার্শনিক-রাজা' শাসন করবে—এক রাজতন্ত্রে। গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরোধী ছিলো প্লেটো। এই অ্যাকাডেমী থেকে তৈরী হতো পণ্ডিত ও প্রশাসক। প্লেটোর মত একই রাজনীতিক বিশ্বাস নিয়েও, সমসাময়িক ইসক্রেটিস্ (Isocrates) কিন্তু অ্যাকাডেমীর বিমূর্ত (গণিতভিত্তিক বৈজ্ঞানিক!) শিক্ষার বিরোধী ছিলো। ইসক্রেটিস্ সাদামাটা জ্ঞানের রিপোর্টিং-সুলভ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলো।[22] অর্থাৎ গ্রীসে শিক্ষাক্ষেত্রে তখন দু'টি মতবাদ—প্লেটো যার মধ্যে বিজয়ী! ডিয়ন (Dion) ছিলো নতুন রাজা ডিয়নাইসিয়াস (দ্বিতীয়)-র ক্ষমতাবান আত্মীয় ও প্লেটোর চিন্তাভাবনার

গুণগ্রাহী—ও গ্রীসের বিতর্কমূলক 'tyrant'! প্লেটোকে সে সিরাকিউজে ডেকে পাঠালো নতুন রাজাকে শিক্ষিত করতে। প্লেটো এলো, কিন্তু সুবিধে হলো না।

প্লেটোর পর অ্যারিস্টট্‌ল্—রাজার অনুগ্রহ পূর্ণপ্রাপ্ত পণ্ডিত। যার আত্মীয়াকে অ্যারিস্টট্‌ল্ বিবাহ করেছিলো—সেই হার্মিয়াস (Hermias) ছিলো এশিয়া মাইনরের বিশাল জমিদার। অ্যারিস্টট্‌ল্ এরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। হার্মিয়াসের গোপন চক্রান্ত ধরা পড়ে যায়, পারস্যের রাজাকে আক্রমণ করার জন্যে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপকে সাহায্য করার। হার্মিয়াস ক্রুশবিদ্ধ হয়। অ্যারিস্টট্‌ল্ এ যাত্রা সরে গিয়ে, রাজা ফিলিপের ছেলে আলেক্সাণ্ডারকে শিক্ষা দেয়ার আমন্ত্রণ পায়। আলেক্সাণ্ডার মহাপরাক্রম রাজা যখন—তখনই অ্যারিস্টট্‌ল্ গড়ে তোলে বিখ্যাত লাইসিয়াম (Lyceum)—অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো।[23] আলেক্সাণ্ডারকে নিয়ে গ্রীক জনতার ক্ষোভে সন্ত্রস্ত অ্যারিস্টট্‌ল্ সব ছেড়ে নির্বাসনে একটি বছর কাটিয়ে মারা যায়।

প্লেটো বা অ্যারিস্টট্‌ল্—অ্যাকাডেমী বা লাইসিয়াম—গ্রীক নাগরিকদের শিক্ষা ক্ষেত্র। উভয়েরই মতামত—'যেমন রাষ্ট্রীয় শাসন, তারই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।' কিন্তু নাগরিক কারা? দাসরা নয়, কৃষকরা নয়, শ্রমিকরা নয়—একেবারে স্পষ্ট।[24] অর্থাৎ অ্যাকাডেমী ও লাইসিয়াম ছিলো গ্রীক প্রশাসনের আরেক আমলা তৈরীর আখড়া। আর নীচশ্রেণী তার শিকার, তার মৃগয়া ভূমি।

ইতিহাসের পরবর্তী সময়কালে সেই একই বিন্যাস—শিক্ষা ও শোষণ, শিক্ষিত ও শোষিত, প্রশাসন ও অশিক্ষিত, লুণ্ঠনকারী ও অশিক্ষিত।

1854 থেকে 1902—ভারতে 'শিক্ষা আন্দোলন' সর্ববিধ। 'নতুন শিক্ষা' হাজির। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষ লগ্নে '1854 সালের ডেস্‌প্যাচ'; শিক্ষা বিভাগ চালু; ভারতীয় কায়দায় শিক্ষার এজেন্টদের সম্প্রসারণ; 'গ্র্যাণ্ট্ ইন্ এইড্' বিকশিত; মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষার সম্প্রসারণ; বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; শিক্ষায় পশ্চিমী বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি; পুরোনো গ্রাম্য পাঠশালা তুলে দিয়ে সরকারী উদ্যোগে নতুন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা; মুসলমান, উপজাতি, হরিজন ও মহিলাদের শিক্ষার বিকাশ; প্রদেশগুলিতে শিক্ষার ব্যাপ্তি; সর্বোপরি বিদ্যাসাগর-কেশবচন্দ্র-বিবেকানন্দ রাণাডে-সৈয়দ আহ্‌মদ-দাদাভাই নওরোজী প্রমুখের শিক্ষা আন্দোলনে গুরুতর ভূমিকা। সমস্ত ভারতে এমন নাড়া এর আগে পড়েনি! ফলাফল—? সযত্ন ইতিহাসে—"শিক্ষার নতুন ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকে দু'টি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করে দিয়েছে—ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ এক উচ্চ শিক্ষিত নারী পুরুষ, সুস্পষ্ট একটা শহুরে ও উচ্চবর্ণ চরিত্রের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়, এবং বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় নিরক্ষর জনগণ যারা গ্রামে বাস করে ও নিম্ন বর্ণের।"[25]

ভারতের এ ইতিহাসকে আরো সম্প্রসারিত করে (প্রায় একশো বছরের ব্যাপ্তিতে) দেখা যায়—"1921-22 সালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা 1821-22 সালের থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।"[26],

সর্বদেশে সর্বকালের মতো, যা হয়েছে—শিক্ষালয় নামক এক ক্যাণ্টনমেণ্টে অভিজাত সেনাদল পুষ্ট হয়েছে কয়েক হাজার বছর ধরে। যারা বেয়নেট নয়—কলমের খোঁচায় শেষ করে দিতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন, আশা বা ভবিষ্যৎকে। পিরামিডের মাথায় চেপে এরাই তারস্বরে পাদদেশের মানুষদের বোঝাচ্ছে—এসো, ওপরে উঠে এসো! অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করো।

শিক্ষা-আমলা : গ্রন্থতন্ত্র ও পাঠ্যতন্ত্র

"A cat may look at a king," said Alice. "I've read that in some book, but I don't remember where"

খ্রীষ্টপূর্ব সময়কালে ভারতের সম্রাট অশোক একটি শিলালেখে সাতটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠের পরামর্শ দিলো—'ধর্ম' পাঠ্যগ্রন্থ।[27] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে—বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠক্রম, অধ্যয়নের জন্যে ঠিক করা হলো।[28] গ্রন্থাবলী এবার সাধারণ পালিতে নয়, সংস্কৃতে। অর্থশাস্ত্র সঙ্গীতকলাটা শূদ্রদের হাতে ছেড়ে দিলো।[29] অন্যত্র স্মৃতিশাস্ত্রে দেখি এমন কি সামগানের শব্দে—অধ্যয়নে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।[30] প্রায় বিস্ফোরণের মতো নীচ বা ইতরদের জন্য পঞ্চমবেদ 'নাট্যশাস্ত্র' জন্মালো ভারতে।[31] অ্যারিস্টট্‌ল্ অবশ্য অধ্যয়নের অবকাশে সঙ্গীতকলায় উৎসাহী। লেখাপড়া ছাড়া শিক্ষিতদের অন্য পরিশ্রম করা বারণ—তারই ফাঁকে সঙ্গীতকলা।[32] অ্যারিস্টট্‌লের এই পরশ্রমজীবীরা বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থে পূর্ণ বিকশিত। অভিজাত বাবুটি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী শুধু নয়—খরিদ্দার ধরে রাখার জন্যে গণিকাকেও নানা শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনায় অংশ নিতে হতো।[33] সঙ্গীতকলা তো বটেই।

আরো কয়েক শতক পরে কৌটিল্য-পরবর্তী রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থ 'শুক্রনীতি' আত্মপ্রকাশ করলো। এবার শুধু বেদ ও বেদাঙ্গ নয়, আয়ুর্বেদ গন্ধর্ববেদ-ধনুর্বেদ ইত্যাকার উপবেদ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হলো।[34] লক্ষ্যণীয় সঙ্গীতকলা যা শূদ্রদের চর্চার বিষয়, বিদ্যার সম্মান পেলো। কিন্তু শূদ্ররা? রাজাকে সতর্ক করে দেয়া হলো—শূদ্রদের যেন প্রশাসনে গ্রহণ করা না হয়।[35]

ইতিহাসে চিরকালই শিক্ষা-বিদ্যা-গ্রন্থের পাঠক্রম ঠিক করা বা বিকশিত করা হয়েছে—শাসক বা অভিজাত শ্রেণীর সুবিধার্থে, শাসনের ও প্রশাসনের সুবিধার্থে। এবং গ্রন্থের বা শিক্ষার স্থপতিদের নির্বাচিত করা হয়েছে সতর্কভাবে—যাতে মুষ্টিমেয়র শাসন কায়েম করা যায়, বজায় রাখা যায়। এর সামান্য বিচ্যুতি হলেই, প্রশাসকরা শিক্ষার ইতিহাস পুনর্গঠন করে নিয়েছে।

যাঁরা রসমধুর 'রুবাইয়াৎ'-এর পদ্য পড়েন, তাঁরা হয়তো জানেন না, এর রচয়িতা ওমর খৈয়াম ছিলো একাদশ শতাব্দীর পারস্যের মূল্যবান গণিতবিদ্-জ্যোতির্বিজ্ঞানী।[36] ওমর যদিও অজস্র পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশংসাধন্য শিক্ষক ছিলো—কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তার মতামতের অপরাধে সমস্ত শিক্ষাদানের কর্ম ও স্থান ছেড়ে তাকে চলে যেতে

হয়েছিলো।

আধুনিকতার অহঙ্কারী ব্রিটেন, এর থেকেও স্বৈরাচারী। যতো বাহাদুরীই নিউটনকে দেয়া হোক—নিউটনের শিক্ষক আইজ্যাক ব্যারো (Issac Barrow) ক্যালকুলাসের বিকাশে অগ্রণী। কিন্তু ব্যারো ছিলো প্রথমত গ্রীক ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপনার যথাযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি—তখনকার দিনে আর্মিনিয়ান-বাদী সমাজ দর্শনের সমর্থক সন্দেহ করে যার চাকুরীর আবেদনপত্র বাতিল করা হয়। আশাহত ব্যারো ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যায়। যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরাজেয় ব্যারো এগারো বছর পর আবার কেমব্রিজেই গ্রীকের শিক্ষকতা ও তিন-চার বছর পর গণিতের প্রথম লুকাসিয়ান অধ্যাপক পদটি পায়।[37]

গ্রন্থ ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের বিকাশ ও বাছাই সমানে চলছে। ক্বচিৎ খোলাখুলি। আমাদের শতাব্দীর দুঁদে গণিতগ্রন্থ রচয়িতা হুইটেকার (E. T. Whittaker) তার এক ঈষৎ অল্পখ্যাত 'দ্য ক্যালকুলাস অফ্ অব্সার্ভেশনস্' গ্রন্থে জানাচ্ছে—হোম আর ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের নিয়োগের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়টি এখন যুক্ত হয়েছে—আগ্রহ বেড়েছে![38] ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন—আর সে শাসনের সুবিধের জন্যে গণিতের এ বিষয়ের প্রথম গ্রন্থাবয়ব!

আমেরিকার শিক্ষা কমিশন দেখলো বাণিজ্যিক লেনদেনে মোট পনেরো হাজার শব্দের দরকার—অতএব বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এটুকু শব্দাবলীই থাকা উচিত। ব্রিটেনে একই চিন্তায়, শব্দের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো মাত্র আটশ'।[39] বাজে শব্দে কাজ কি? যদিও এই শব্দ-সংখ্যার বাইরে গেলে এ শিক্ষিতরা—মানুষের ভাবপ্রকাশকে ধরতে পারবে না!

এই সতর্ক শব্দচয়নে, গ্রন্থরচনায় ও শিক্ষণে একটি স্বতন্ত্র শাসন জন্মেছে কয়েক হাজার বছর ধরে। এই স্বতন্ত্র শাসনের অন্যতম ভিত্তি গ্রন্থতন্ত্র। নির্দিষ্ট গ্রন্থ, নির্দিষ্ট শিক্ষিতের লেখা (আধুনিককালে নির্দিষ্ট প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত)—সর্বক্ষেত্রে শেষ কথা। যে যতো বেশী সে গ্রন্থাবলী উদ্ধৃত করতে পারবে, পড়ে ফেলতে পারবে—সে ততো শিক্ষিত, ততো শক্তিশালী। য়ুরোপের 'নব জাগরণের' সময়ে বিচিত্র দক্ষতার জন্যে বিশ্বখ্যাত অথচ জ্ঞানচর্চায় প্রায় অজ্ঞাত—লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি, এ ব্যাপারটাতে আঘাত করে, তার বিশাল নোটবুকের কয়েক ছত্রে। তার ভাষায়[40]—"যারা অপরের শ্রমে নিজেদের সজ্জিত করে, তারা আমার নিজস্বতাকে চাইবে না।...তারা জানে না যে আমার বিষয়াবলী কথার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা দিয়ে বিবেচ্য; আর (অভিজ্ঞতা) হলো যারা ভালো লেখে তাদের কর্ত্রী।...যদিও, আমি তাদের মতো, অন্য লেখকদের উদ্ধৃত করতে সমর্থ নাও হতে পারি—আমি অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখবো, যা তাদের কর্তাদের কর্ত্রী—যেটা অনেক বৃহৎ ও বেশী কাজের।" লক্ষ্যণীয়—বর্তমান লেখককেও বর্তমান প্রবন্ধের জন্যে অজস্র কর্তাব্যক্তিদের উদ্ধৃত করতে হচ্ছে, বক্তব্যকে জোরালো করার জন্যে।[41] সভ্য অন্ধবিশ্বাস এতোই বিচিত্র অন্ধ যে—কর্তাদের কর্ত্রী, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে দেখতে পায় না, দেখতে চায় না।

পশ্চিমবঙ্গ 1969-70 : উগ্রপন্থী বিবেক

তখন উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গ, 1969-70 সাল। কলকাতার ও শহরতলীর বহু যুব-ছাত্ররা বললো—এ শিক্ষা ব্যবস্থা বুর্জোয়া। তারা নকসাল বা উগ্রপন্থী নামে চিহ্নিত। স্কুল-কলেজে হলো ভাঙচুর। এরা 'যে যতো পড়ে, সে ততো মূর্খ হয়', এমন একটি দুর্লভ উদ্ধৃতিও ব্যবহার করলো। ক্রুদ্ধ হলো কর্তৃপক্ষ, সরকার, শাসক। নকসাল প্রমিথিয়ুস্‌রা উত্তাপ দিতে পারলো না, সমস্ত দেশের মানুষকে—নিজেদের মশালটা কখন নিবিয়ে দিয়ে, লুটিয়ে পড়লো শিক্ষালয়ের চাতালে। লাভ হলো—প্রমিথিয়ুসের পপুলার মুখাবয়বের মুখোস বন্টিত হলো শত-সহস্র সংস্করণে। শিক্ষালয়ের কাছে নতজানু এই নয়া শ্রেণী—কেউ এখন ভালো শিক্ষক, ভালো ছাত্র। প্রায় বিশ বছর ধরে খতিয়ে দেখা হলো না—ভাঙচুরটা যদি ভুল হয়ে থাকেও—স্কুল-কলেজগুলো কি ঠিক ছিলো? বা ঠিক আছে?

'ওরা' চুপ করে বসে থাকেনি। 'ওরা' মানে ছয়ের দশকের শেষের—শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের কর্তাব্যক্তিরা। উত্তাল, উদাত্ত পশ্চিমবঙ্গে তখনই শিক্ষাব্যবস্থার হালহকীকৎ দেখার জন্যে দুঁদে এক প্রজেক্ট শুরু হয়—অম্লান দত্তর নেতৃত্বে। একে একে নিভিছে দেউটি, উগ্রপন্থী বিবেক যখন ক্রুশবিদ্ধ—প্রায় নিঃশব্দে 1974 সালে প্রকাশ পেলো এই রিপোর্ট গ্রন্থাকারে।[42] পরিসংখ্যান, সমীক্ষা, সামঞ্জস্য বা সাযুজ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ, অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ এ রিপোর্ট। কলকাতার এগারো আর মফস্বলের এগারোটি কলেজের ওপর, 1970 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থিত এ সমীক্ষা। এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। এখানে তারই কিঞ্চিৎ উদাহরণ—

1. কলকাতার ও মফস্বলের কলেজগুলির গড় বয়স যথাক্রমে 60·45 এবং 39·36 বছর—অর্থাৎ মফস্বলে সাধারণত অনেক পরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

2. যদিও বাংলা সবক'টিতে প্রথম ভাষা, কিন্তু বিকল্প ইংরেজী কলকাতা ও মফস্বলে যথাক্রমে 27·2 এবং 9 শতাংশ কলেজে পড়ানো হয়। হিন্দী ও উর্দুর ওই হিসেব যথাক্রমে 72·7 এবং 18·1, আর 18·1 এবং শূন্য শতাংশ। অর্থাৎ কলকাতা এ ভাষাগুলিতে সুবিধেভোগী।

মূলত শিক্ষালয়গত শিক্ষার ব্যবস্থাটা কলকাতার শহুরেদের সুবিধে দেওয়ার জন্যে, এমনি একটা আব্ছা ধারণার পর দেখা যাবে—

3. এগারোটি কলকাতার কলেজে যেখানে 23 জন ছাত্রের পরিবারে মাথাপিছু আয় 19 টাকার কম, সেখানে ন'টি মফস্বল কলেজে এ সংখ্যা 204! মাথাপিছু আয় যতো বাড়ে, মফস্বলের থেকে কলকাতার ছাত্র সংখ্যাও বাড়ে। অবশেষে, মাথাপিছু 300 টাকার অধিক আয়ের হিসেবে, মফস্বলে একটি ছাত্রও নেই!

কলকাতার শিক্ষালয়গত শিক্ষাব্যবস্থাটি মূলত বড়োলোকের ও মফস্বলেরটা গরীব লোকের—এ আব্ছা ধারণার পরে দেখি—

4. কলকাতায়—19 টাকার কম মাথাপিছু আয়ের পরিবারের ছাত্ররা একজনও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়নি ; আবার, সেটা মাথাপিছু 350 টাকার অধিক হলে কেউ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়নি ! আর এই বাইশটি কলেজেই সত্য—বড়োলোকদের ঘরের ছাত্ররাই পরীক্ষায় 'ভালো ফল' করে !

এখানে পাঠ্য বিষয়বস্তু, সেটা বুর্জোয়া না প্রলেতারিয়েত বিবেচনায় আনছি না। স্পষ্টতই 1969-70 সালের পশ্চিমবঙ্গের কলেজের নমুনা সমীক্ষায় নগ্ন হয়ে যায়—শহুরে ও স্বচ্ছলদের শিক্ষাব্যবস্থা। আর এটাই স্বাভাবিক—শহর ও স্বচ্ছলতা থেকে শাসন তৈরী হয়। প্রাচীন গ্রীস বা ভারতে সত্য—আজও সত্য। কিন্তু এ অভিজাতদের শিক্ষার খরচ চালায় কে ? অবশ্যই অস্বচ্ছল বা গরীব মানুষেরা—যাদের সুকৌশলে বঞ্চিত করে তৈরী হয়েছে এ শিক্ষাব্যবস্থা। তাদের তো অধিকার আছে স্বরচিত বিষবৃক্ষকে সমূলে তুলে ফেলা। প্রায়-দুর্লভ একটি প্রবন্ধে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একবার লিখছে (এবং ধূর্ত যে শিক্ষিতরা 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিকী'তে উন্মত্ত, তাদের উদ্দেশে আংশিক উদ্ধৃতি এখানে ব্যবহার করছি)[43]—"আর একটি কথা এই সম্পর্কে আমার মনে আসিতেছে, বাঙ্গালার চাষীরা কি এখনই শিক্ষার জন্য চাঁদা দিতেছে না ? শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র পিছু গড় ব্যয় হয় 755 টাকা। ইহার মধ্যে গভর্নমেন্টকে দিতে হয় 300 টাকা ; ও ঢাকায় ছাত্র-পিছু গভর্নমেন্টের ব্যয় 343 টাকা ; ইস্‌লামিয়া কলেজে 150 টাকা ; এই টাকা আসে কোথা হইতে ?..... উকিল, ব্যারিষ্টার, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ের দালাল, ইস্তক হাই-কোর্টের জজকে পর্যন্ত আমি "পরগাছার" সামিলে ফেলিয়া থাকি, কারণ ইহারা সকলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কৃষককে পিষিয়া উদর পূর্তি করিতেছেন। .....দরিদ্র কৃষক আধপেটা খাইয়া উপবাস করিয়া যে টাকা জোগাইতেছে তাহার সাহায্যে আমরা শিক্ষাবিভাগেও আভিজাত্যের সৃষ্টি করিতেছি।.....যখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে নিরক্ষর চাষীর প্রতি-নিধিত্বের দাবি করি, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দৃষ্টি থাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থের উপর।"

1931 সালে চীনে বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষা সংস্কারের সমর্থনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজের দেশের কথা এই ভাষাতে বলতো। তার চল্লিশ বছর পর এই "আভিজাত্যের" বিরুদ্ধে লড়লেই, "পরগাছাদের" বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-প্রতিবাদী হলেই—উগ্রপন্থী !

শিক্ষার অর্থনীতি

"If everybody minded their own business," the Duchess said in a hoarse growl, "the world would go round a deal faster than it does." Which would *not* be an advantage," said Alice, who felt very glad to get an opportunity of showing off a little of her knowledge.

মানুষের মননের একটা কৃত্রিম পিরামিড আছে—যার নাম শিক্ষা। আর পাঁচটা পিরামিডের মতো—এটাকে গড়তে দরকার হয়েছে—কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক-দাস-নিম্নশ্রেণীর মানুষের অর্থ ও শ্রম। শুধু তফাৎ হলো পাথরের চাঁইয়ের পরিবর্তে—পিরামিডের উচ্চতার থরে থরে সাজানো হয়েছে কিছু মানুষদের—যাদেরকে বলে শিক্ষিত।[44]

মনন শব্দটি এখানে গভীর আর ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি। কার্ল মার্ক্সের অতীব সুসংগঠিত আর্থনীতিক রচনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে সৃষ্টি-শীল মননকে—যা অনুৎপাদক (unproductive)। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরীর জন্যে যে অর্ডারী মনন, তা সৃষ্টিশীল হতে পারে না।[45] যদি তাই হয়, তবে—যে শিক্ষা বা পাণ্ডিত্য স্রেফ্ পণ্যের মতো অর্ডার নেওয়া ও সরবরাহের তুল্য, তা কখনো সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল থাকে না। আমরা গোঁড়া ও চিরায়ত মার্ক্সবাদের প্যাঁচে পড়ে গেলাম। কারণ, নতুন নতুন সৃজনশীল বা আবিষ্কারমুখী যে শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের প্রচারে আমরা অভ্যস্ত —মার্ক্সবাদী অর্থনীতি তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। আর তাই শিক্ষালয়গত শিক্ষা বা পাণ্ডিত্য, সৃজনশীল সাহিত্য-শিল্প-জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়ে তুলবে এমন সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু যা চলছে, অর্থাৎ উৎপাদন মননটা তা হলে কোন্ জাতের ? ঠিক মার্ক্সীয় অর্থনীতি দীর্ঘ সময় এর উত্তর দিতে পারেনি। মূলত এ শতাব্দীর ছয়ের দশকে সেই নির্মম বিশ্লেষণগুলো এসে হাজির হলো নিটোল তত্ত্বের চেহারায়—প্রায় আঘাতের মতো।[46]

নিছক অ্যাকাডেমিক অর্থনীতির অজস্র রচনায় ধ্বনিত হতে লাগলো 'মানবিক পুঁজি' বা 'Human Capital' শব্দযুগল। এর অন্যতম প্রবক্তা সুল্ট্‌স্ (T W. Schultz) এ ধারণার সূত্রপাত করার সময় অতীব সতর্কতার সাথে আমাদের চিরকেলে বিশ্বাসটিকে পুনর্গঠন করেছে।[47]

কেনা গোলামের ক্ষেত্রেই আমরা বিশ্বাস করতাম—মানুষটা পুঁজি। তথাকথিত আর্থনীতিক অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের এই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে নীতি ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে। তবুও হাতের কাজ-জানার ক্ষেত্রে, আমরা বিশ্বাস করি দক্ষতা ভাঙিয়ে শ্রমিকটি খায়—আর শিল্প-পতিরা এ দক্ষতা বানিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে নিজেদের স্বার্থেই। সভ্যতা তবুও মানুষকে পণ্য হিসেবে ভাবার বিরুদ্ধেই প্রচার করেছে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হলো—

ক্রীতদাসের গতর, শ্রমিকের হাতের দক্ষতা শুধু নয়—মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি, মনন, চিন্তাশীলতাও একটা পুঁজি, যা সমৃদ্ধ করে শক্তিশালী হয়েছে আর্থনীতিক কর্তৃত্ব। শিক্ষা—মানুষের সেই মানসিক অংশকে পুঁজি হিসেবে গড়ে তোলে। এটাই 'মানবিক পুঁজি'।

বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক-স্নাতকোত্তর-স্নাতকোত্তরোত্তর—বিনিয়োগ, আরো বিনিয়োগ। শীতল মস্তিষ্কের সুচতুর সরকার, ছাত্রের অভিভাবক, বয়স বাড়লে ছাত্ররাও জানে—আখেরে এটা ভাঙিয়ে অর্থ-প্রতিপত্তি, আরো অর্থ-প্রতিপত্তি। ছোটো কারখানা, আরো বড়ো,

আরো আরো বড়ো—যা বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশী উদ্বৃত্ত মূল্য আসবে।

'মানবিক পুঁজি' সংক্রান্ত ও অন্য বিশ্লেষণাত্মক এতো রচনার বিরাট দু'টি সংকলন বেরোলো ব্লউগ্ (M. Blaug)-এর সম্পাদনায় 1969-70 সালে—যে অর্থনীতির সামান্য আভাস দিতে পারলো না পশ্চিমবঙ্গ বা ফ্রান্সের ছাত্ররা। এমন কি পূর্বোক্ত অম্লান দত্তের নেতৃত্বের সমীক্ষাও যদিও এক জায়গায় স্বীকার করেছিলো—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থনীতিক কাঠামোয় মিল আছে।[48] যার জন্যে—দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণের পদ্ধতির সামান্য হেরফের করে প্রথমটিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

নিছক অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণে—যার যতো শিক্ষা, তার ততো পুঁজি।

তারপর? শিক্ষিত মানে দাঁড়ালো এক নিটোল পুঁজিপতি—অশিক্ষিতরা যা নয়। শিক্ষিতদের সংঘ, আরেক চেম্বার অফ্ কমার্স্। শুধু দু'দলের পণ্যটাই ভিন্ন।

ভাবনা

মাতাল স্বামীর পিটুনী, দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে মমতা চাইছে ওর ছেলে রাজাকে 'লেখাপড়া' শেখাবে—বাড়ী বাড়ী ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ও ঠিকে-ঝিয়ের কাজ করে। আমি জানি, রাজা ছেলেটি ক্লাশ ফাইভ-সিক্সেই প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করবে। চন্দন অসম্ভব বুদ্ধিমান—বাবা মাতাল রিক্সাওলা, মারা গেছে। চোদ্দ বছরের চন্দন পেটের দায়ে—কোথায় পালিয়েছে। কয়েক দিন আগে, আড়াই বছরের সুলেখার সাথে সময় কাটাচ্ছিলাম। সুদূর কুলতলীর গরীব চাষীর মেয়ে। অবাক করা বুদ্ধি। কিন্তু ও 'প্রতিভা' হবে না—বেঁচে থাকলে মাত্লার বুকে মাছের চারা ধরবে, মুড়ি ভাজবে, সব্জির চাষ দেখবে। ওর মা, দিদিরা তাই তো করছে।

অ্যারিস্টট্ল্ ওদেরকে বলেছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় লোক। সবাই জানি—এখনও তাই। ওরা সমস্ত দেশটাকে খাওয়াবে—আর বিপুল অর্থ জোগাবে। তাই দিয়ে তৈরী হবে কিছু শ্রমমুক্ত সময়—যাতে পরশ্রমে পাঠ্যাভ্যাস করবে মুষ্টিমেয় মানুষ। যাদেরকে বলা হবে শিক্ষিত। ইতিহাস হাজার হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে, মননের ওপর কর্তৃত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে—জন্ম দিয়েছে মনন-শাসকদের নিখুঁত করে।

প্রকাশ্যে বলা হবে না—সুলেখার বাবা যেভাবে যত্ন নিয়ে গরুর বাছুরটাকে বড়ো করেছে, আখেরে লাভ আছে বলে—সে কারণেই মানব-বৎসটি স্কুল-কলেজে বড়ো হয় সযত্নে। তফাৎ শুধু—গো-বৎস শিক্ষাশাসক হয় না।

গণশিক্ষা, ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। ঘটে যদি—ভেঙে পড়বে পুরো পিরামিডটা—সবটাই হয়ে যাবে আনুভূমিক। নাম তার আর শিক্ষা থাকে না। চিরায়ত সাম্যবাদের মতো শুধু পড়ে থাকবে—যার যেখানে যতোটুকু দরকার জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

ঘটনাচক্রে, যে উদ্দেশ্যেই হোক—মুষ্টিমেয়র সুবিধেভোগে মানুষের মননের ক্ষেত্রে যা অর্জিত হয়েছে—সব মানুষেরই এতে সমান অধিকার। কারখানার মালিক বা আড়ৎদার যেমন সম্পদ বা পুঁজিকে তালা দিয়ে আইন দিয়ে রক্ষা করে—শিক্ষামালিকেরাও তার পুঁজিকে অন্যরূপে তালা ও আইন দিয়ে রক্ষা করে। অশিক্ষিতরা গ্রন্থতন্ত্রে ঢুকতে পারে না, স্ট্যাম্পের অভাবে শিক্ষাপ্রশাসনে ঢুকতে পারে না—তালা ও আইন এমনই।

বুভুক্ষু পৃথিবীতে মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের জন্যে সংগ্রাম শেষ হয় নি। আর সে সংগ্রামটুকুর জন্যেই মানুষ প্রথম মানুষ হয়েছিলো। এখনও সে প্রয়োজনেই তার কাজে লাগবে ইতিহাসে অর্জিত জ্ঞান-সম্পদ। যে কেউ তাই যে কোনো জ্ঞান-আড়ৎ থেকে সম্পদ আহরণ করবে—দরকার হলে লুঠ করবে। সব তালা না খোলা গেলেও। লড়তে হবে—শিক্ষা-মূলধনের বিরুদ্ধে। লড়তে হবে শিক্ষা-শাসন ও শিক্ষা-শাসকদের বিরুদ্ধে, শিক্ষা-ক্ষমতার বিরুদ্ধে।

পাথরে খোদাই অপূর্ব ভাস্কর্য, চমকপ্রদ কঠিন অঙ্ক, দুরন্ত সাহিত্য—সবই তো তৈরী হয়েছে মুষ্টিমেয়র স্বার্থে। সব মিলিয়েই মানব-ইতিহাসের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু—

আর্থিক মুনাফা আর সামাজিক-রাজনীতিক ক্ষমতার স্বার্থে ইতিহাসে যে মনন-সংস্কৃতির প্রভুশ্রেণী তৈরী করা হয়েছে, যাদের নাম 'শিক্ষিত'—তাদের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-অনিবার্যতার অন্ধবিশ্বাস না ভাঙতে পারলে—শোষণের পিরামিডটা একই রয়ে যাবে॥

টীকা ও নির্দেশিকা

1. উদাহরণস্বরূপ ; *Education and National Development*, Report of the Education Commission 1964-65, Vol. 3, NCERT, 1970, Plates 1—5 ইত্যাদি। শব্দার্থে "..... the term education is used restrictively to refer to the socialisation that takes place within the formal system of education." লিখছে সমাজতত্ত্ববিদ্রা Gore, M.S. & I. P. Desai : 'The Scope of a Sociology of Education', দ্রষ্টব্য সংকলন M. S. Gore, I. P. Desai & Suma Chitnis (ed.) : *Papers in the Sociology of Education in India*, NCERT, Delhi, 1975, পৃষ্ঠা 2.
2. "আমাদের সামনে শিক্ষার চ্যালেঞ্জ বস্তুত কৃৎকৌশলগত বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ নয়, তা হল দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও বেকারত্ব দূরীকরণের চ্যালেঞ্জ।" কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি বিরোধিতা করার সময় লিখছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী (উচ্চতর বিভাগ) শম্ভু ঘোষ, **চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন—শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপট**, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 1986, পৃ. 10.
3. *News Bulletin*, All India Federation of University

and College Teachers' Organisations, August 1978, পৃ. 16.

4. শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ : **রাজ্যের শিক্ষাচিত্র তখন ও এখন**, কলিকাতা, 1981.
5. ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস সেন্টার (প: বঃ) : **রাজ্য কমিটি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট নির্বাচন '87**, কলিকাতা, 1987, পৃ. 10.
6. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি : **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গভীর গভীরতর অসুখ এখন**, কলিকাতা, 1986, পৃ. 3.
7. H. S. Asthana ও Suma Chitnis, 'The Disturbed Campus' প্রবন্ধে জানায় "The failure of the education system in training the younger generation adequetly for occupational roles, the failure to perform competently the function of socializing the younger generation and the failure to adopt its norms and procedures and policies to the changing values and attitudes in the country are the principal causes of disaffection for the system among those who participate in it. Corrective measures are urgently needed." Gore, Desai & Chitnis (ed.) : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 329.
8. Misra, Shailendra : *Police Brutality*, Vikas, New Delhi, 1986, সারণী 3.5, পৃ. 40.
9. ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নাট্যশাস্ত্র' স্পষ্ট ভাষায় কোন্ শ্রেণীর কোন্ উপভাষা বর্ণনা করেছে। গৌণ সূত্র : Banerjee, Satya Ranjan : *The Eastern School of Prakrit Grammarians*, Vidyasagar, Calcutta, 1977, পৃ. 14 এবং 19-20.
10. "শুদ্ধ হিন্দীর দেশ, অর্থাৎ পশ্চিমা-হিন্দীর দেশ হইতেছে, পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ ও পূর্ব-পাঞ্জাব—অর্থাৎ আর্য্য-ভাষী ভারতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ।" চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : **ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা**, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, 1949.
11. De Morgan ঘটনাটি বর্ণনা করেছে। অংশবিশেষ : Smith, David Eugene : *History of Mathematics*, Vol. I, Dover, New York, 1958, পৃ. 522-23.
12. নৈরাজ্যবাদীদের পোস্টকার্ডে (1911) আঁকা পিরামিডের একটি শ্রেণী (যাজক, পণ্ডিত ?) WE FOOL YOU (দ্রষ্টব্য Woodcock, George : *Anarchism*, Penguin, Middlesex, 1963 গ্রন্থের প্রচ্ছদ)। শিখর থেকে নীচে শ্রেণীরা CAPITALISM/ WE RULE YOU/WE FOOL YOU/WE SHOOT YOU/WE EAT FOR YOU/WE FEED ALL (এরাই শ্রমজীবী)।
13. "Practical wisdom only is characteristic of the ruler : it would seem that all other virtues must equally belong to ruler and subject." স্পষ্টভাবে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছে। দ্রষ্টব্য : Jowett, Benjamin (tr.) : *Aristotle's Politics*, Modern Library, New York, 1943, পৃ. 134.
14. Xenophon সক্রেটিস্-সমর্থনেই অভিযোগের ঘটনাবলী 'Memorabilia' গ্রন্থে লিখেছে। অংশবিশেষ : *The Life and Death of Socrates*, J. M. Dent, London, 1923, পৃ. 41 এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য : Greene, Jay E. (ed.) : *100 Great Thinkers*, Washington Square, New York, 1967, ঘটনাটি পৃ. 54.
15. Taylor, A. E. : *Plato the Man and His Work*, Methuen, London, 1978, পৃ. 8 ; জীবনীর জন্য : Greene (ed.) : পূর্বোল্লিখিত, বিশেষত পৃ. 61-62.
16. Max Lerner লিখিত ভূমিকা : Jowett : পূর্বোল্লিখিত পৃ. 10 এবং Greene (ed.) : পূর্বোল্লিখিত, বিশেষত পৃ. 71.
17. Saks, Stanislaw & Antoni Zygmund : *Analytic Functions*, Nakladem Polskiego, Warszawa, 1952 গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণে Zygmund-এর মুখবন্ধ।
18. যাস্ক-র **নিরুক্ত** : 1.2.3.1 ; কৌটিল্য-এর **অর্থশাস্ত্র** : 1.3.1.
19. শূদ্রদের বিভিন্ন কর্মের মধ্যে একটি 'দ্বিজাতিশুশ্রূষা' (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজদের সেবা করা)। **অর্থশাস্ত্র** : 1.3.1.
20. মগধরাজের পুত্র 'তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা' করে রাজপদ পেলো॥ **শোণক-জাতক** ॥ বারাণসী রাজপুত্রর তক্ষশীলায় শিক্ষা॥ **সংকৃত্য-জাতক** ॥ ইত্যাদি।
21. Taylor : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 6.
22. "It was his (Isocrates') boast that the education he had to offer was not founded on hard and abstract science with no viable humanistic interest about it ;..."—Taylor : উপরোল্লিখিত, পৃ. 5. তা ছাড়া পৃ. 318.
23. Greene (ed.) : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 64-65.
24. Jowett (tr.) : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 134-35 এবং পৃ. 320-22. "The necessary people are either slaves who minister to the wants of individuals, mechanics and labourers who are the servants of the community." পৃ. 135.
25. Nurullah, Syed and J. P. Naik : *A Students' History of Education in India (1800-1947)*, Mac-

[বাকি অংশ 17'র পৃষ্ঠায়]

গঙ্গা শোধন প্রকল্প : প্রযুক্তি নির্বাচন ও স্বনির্ভরতা

জল শোধন প্রকল্পে হল্যাণ্ড থেকে প্রযুক্তি আমদানি প্রসঙ্গে একটি পর্যালোচনা। দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা রূপায়ণের নীতি ও প্রতিশ্রুতি অনেকটাই আনুষ্ঠানিক……।

গঙ্গা শোধনের জন্য 'ডাচ টেকনোলজি'র (Dutch Technology) প্রয়োগ কতটা প্রয়োজনীয়? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য আজ দুটি শব্দ খুব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—'টেকনোলজি' ও 'উন্নয়ন সহায়তা'। উন্নয়ন মানে কি? যদি স্বাধীনতার আগে কোনো শহরে বাইশটা কারখানা থেকে থাকে আর আজ দেখা যায় দুশোটা আছে তাহলে সেই শহরকে উন্নত বলে ধরা হয়। এই ধারণায় চলতে চলতে আজ বড় কারখানা, উঁচু বাড়ী, বড় বাঁধ—এই সব কিছুই উন্নতির সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক বছর সরকারী তথ্য জানায় : এ বছর আমাদের কারখানায় এত কোটি টন মাল উৎপাদন হয়েছে, এত কোটি টন খাদ্যশস্য হয়েছে ; ইত্যাদি। এই সব থেকে যে পরিভাষাটা তৈরী করা যায় সেটা হ'ল, মনুষ্য সমাজ ও দেশের উপযোগের জন্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জিনিসের অধিক উৎপাদনকেই উন্নয়ন বলা যেতে পারে। এরই ভিত্তিতে বিশ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—উন্নত ও উন্নয়নশীল। এই গতির সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির থেকে সহায়তা নিচ্ছে। এরই পিছনে আসছে প্রযুক্তি (technology) ; আর তারপর শুরু হচ্ছে ঋণশোধের পালা।

এখন প্রশ্ন, প্রযুক্তি কি? উন্নয়নের গতিকে বাড়াবার জন্য নতুন নতুন কৌশলগুলিকে প্রযুক্তি বলা হয়। কিন্তু যে দেশে কোনো প্রযুক্তিকে বাইরে থেকে আমদানি (import) করা হয় সেদেশে তার তিনরকম সম্ভাব্য প্রভাব দেখা দিতে পারে। প্রথম প্রভাব ইতিবাচক—যদি আমদানি করা প্রযুক্তি দেশীয় প্রযুক্তির চেয়ে উন্নত স্তরের হয় তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। যেমন আমেরিকা দ্বারা P.L. 480 মারফৎ কৃষিকাজের জন্য যে সহায়তা ভারতকে দেয়া হয়েছে সেটা 'সবুজ বিপ্লবের' ভিত্তি তৈরী করেছে। অবশ্য প্রশ্ন উঠছে যে কীটনাশক, সার, নিবিড় জলসেচ, উচ্চ ফলনশীল বীজের ওপর একান্ত নির্ভরশীল যে কৃষি-পদ্ধতি সেটা কি সত্যিই 'সবুজ বিপ্লব'? দ্বিতীয় প্রভাবটি নেতিবাচক —যখন আমদানি করা প্রযুক্তি প্রচলিত দেশীয় প্রযুক্তির চেয়ে নিম্নস্তরের। তৃতীয় প্রভাব—যখন আমদানি করা প্রযুক্তির স্তর দেশীয় প্রযুক্তির স্তরেরই সমান। বিদেশ থেকে আমদানি করা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর প্রযুক্তি-তেই ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে। যেমন, সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় ভারতে পরমাণু প্রকল্প স্থাপন, এবং তেহরি বাঁধে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহায়তা। ভারত গত চল্লিশ বছরে পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তা ছাড়াই উল্লেখযোগ্য 'সাফল্য' অর্জন করেছে, কিন্তু আজ এই নতুন সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে ভারতের পরমাণু গবেষণায় গভীর আঘাত লাগবে—বিশেষজ্ঞরা আজ এটাই মনে করছেন। বাঁধ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রতিটি উন্নত দেশ আজ বড় বাঁধ তৈরী বন্ধ করে দিয়েছে। খোদ রাশিয়ায় বড় বাঁধের পুনর্মূল্যায়ন ও অপকারিতার ওপর তৈরী চলচ্চিত্র বম্বে আর দিল্লীর সোভিয়েত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে দেখানো হচ্ছে। আসলে এরকম নিম্নস্তরের প্রযুক্তি আমদানি করতে সম্মতি যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের বিবেচনাশক্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এবার দেখবো গঙ্গা শোধন প্রকল্পকে। 1984 সালে সাধারণ নির্বাচনে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গোটা গঙ্গানদীকে দূষণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। ডিসেম্বর 1984-তেই পরিবেশ মন্ত্রণালয় একটি Action Plan তৈরী করে, যার প্রথম পর্যায়ে 290 কোটি টাকার বাজেট তৈরী হয়। এই পর্যায়ের কনট্রাক্টে কানপুরে জলশোধন যোজনার আর মির্জাপুরে জলকে স্বল্পব্যয়ে কাজে লাগানোর প্রকল্পের ভার দেওয়া হয় হাস্‌কোনিং নামে হল্যাণ্ডের এক কোম্পানীকে। প্রকল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো UASB কৌশলে দূষিত জলকে শোধন করা এবং তা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরী করা। এই প্রযুক্তির প্রভাব কি হতে পারে তা দেখার জন্য UASB কৌশলটি কি সেটা বোঝবার বিশেষ প্রয়োজন। UASB (Upflow anaerobic sludge blanket) হলো এমন এক bio-reactor যাতে বর্জিত জলের anaerobic utilisation করা হয়। বর্জিত জলের সদ্ব্যবহারের দুটো পদ্ধতি আছে—একটি aerobic যাতে অক্সিজেনের সাহায্যে কার্বনিক পদার্থকে কার্বন ডাই অক্সাইড আর জলে ভাঙা হয়। দ্বিতীয় anaerobic যাতে অক্সিজেন ছাড়াই কার্বনিক পদার্থকে মিথেনে রূপান্তরিত করা হয়। UASB বায়ো রিঅ্যাক্টারের নিচ দিয়ে দূষিত জল ঢোকে এবং ওপর দিয়ে মিথেন গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।

কিন্তু এই প্রকল্প শুরু করায় নানারকম সমস্যা আছে। যেমন এই পদ্ধতিতে দূষিত পদার্থকে ভালো দানাযুক্ত (granular) sludge-এ পরিণত করতে হয়। এই প্রকল্প চালু রাখবার জন্যে উচ্চস্তরের প্রশিক্ষ-ণেরও বিশেষ প্রয়োজন।

বর্জিত জল সদ্ব্যবহারের জন্য 'অ্যানারোবিক' পদ্ধতিতে যতগুলি কাজ ভারতে ও হল্যাণ্ডে হয়েছে তার একটা তুলনা এবার করা দরকার। ভারতে 1959 সালে NEERI (National Environmental Engg.

Research Institute) স্থাপন করা হয়েছে। 1962 সালে NEERI-র একটি গবেষণাগার খোলা হয় কানপুরে, আর 1970 সালে একটি আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্সে নিরির Anaerobic Treatment Technology-র সাফল্য ঘোষণা করা হয়। 1972 সালে বেশ কিছু জায়গায় 'নিরি' এটি পরীক্ষা ক'রে সফল হয়েছে। তখন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যানারী, কসাইখানা, ডিস্টিলারি এবং পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জলকে শোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য দিকে Dutch Anaerobic Technique-এর শুরু 1970 সালে লেটিঙ্গার গবেষণাগারের কাজ থেকে। এর পর 1975, '76 এবং '79 সালে এই প্রক্রিয়ায় হল্যাণ্ডের কসাইখানা, চিনিকল আর পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল শোধন করা হয়। 1982 সালে কলম্বিয়ার গৃহস্থালীর দূষিত জলকে (Domestic sewage) শোধনের জন্য সেখানে Dutch Technology আমদানি করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'অ্যানারোবিক প্রক্রিয়া' ভারতবর্ষে অনেক দিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার ভারতে এবং হল্যাণ্ডে 'অ্যানারোবিক' পদ্ধতি ব্যবহারের ফলাফলের ওপর একটু নজর দেওয়া যাক। এই প্রক্রিয়ায় B.O.D. বা C.O.D-এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। আসলে দূষিত জলে দু ধরনের অশুদ্ধতা আছে —একটি হচ্ছে কার্বনিক, যেটা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রাকে Biological Oxygen Demand (B.O.D) বলা হয়। দ্বিতীয়টি রাসায়নিক অশুদ্ধতা, যেটি দূর করবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রাকে Chemical Oxygen Demand (C.O.D.) বলা হয়। এছাড়া নানা Pathogen-কেও জল থেকে সরাতে হয়।

1982 সালে কলম্বিয়ার গৃহস্থালীর বর্জিত জলকে শুদ্ধ করার জন্য যে Dutch Technology আমদানি করা হয়েছিল সেই প্রযুক্তির U A S B plant কেবলমাত্র কলম্বিয়াতেই চলছে। তাই সেখানকার ফলাফলের ওপর একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। পয়ঃপ্রণালীর বর্জিত জল শোধনে কলম্বিয়াতে 50% pathogen দূর করার সাফল্য পাওয়া গেছে। B. O. D.-র মাত্রা কমাবার ক্ষেত্রে 84% এবং C. O. D.-র ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 68% সাফল্য দেখা গেছে। অন্যদিকে ভারতে 'অ্যানারোবিক ফিল্টার' দিয়ে 72% থেকে 75% pathogen দূর করা হয়েছে। B. O. D. আর C. O. D-র মাত্রা কমাবার ব্যাপারে কিন্তু U A S B technique-এর একটা বড়ো ত্রুটি আছে। কলম্বিয়াতে (যেখানে তাপমাত্রা 25° C মতন) কিছু ভালো ফল পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু এটাকেই যখন হল্যাণ্ডে (যেখানে তাপমাত্রা 20°C মতন) প্রয়োগ করা হয় তখনকার ফলগুলি বেশ হতাশাজনক। কানপুরে শীতকালে তাপমাত্রা 20°C-এর নীচে চলে যায়, এবং তখনকার ফলগুলো খারাপই পাওয়া গেছে। অন্যদিকে গরমকালে কানপুরের তাপমাত্রা 40°C-এর ওপরে চলে যায়, সেটাও ঐ প্রক্রিয়ার সাফল্যকে প্রভাবিত করবে। এই প্রযুক্তিটি সাধারণত 25°C-এ সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

সবদিক ভেবে যদি আমরা ধরেও নিই যে এই প্রক্রিয়ায় ভারতে 84% B. O. D. কমানো যাবে, সেক্ষেত্রেও একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। B. O. D-র সর্বোচ্চ মাত্রা কমানোর পরেও 30 millgram per unit-এর বেশি effluent থাকে। এটা উত্তরপ্রদেশ জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত সীমার থেকেও বেশি। তাই এভাবে জল শোধনের পরেও এটাকে গঙ্গায় ছাড়া হয় না। আবার C. O. D-র মাত্রা কমাবার ক্ষেত্রে U. A. S. B. প্রক্রিয়ায় যেখানে 68% পর্যন্ত সাফল্য পাওয়া গেছে, সেখানে অন্য প্রক্রিয়ায় 90% পর্যন্ত সাফল্য পাওয়া গেছে। এ থেকে পরিষ্কার, যে ময়লা জল শোধনের জন্য এই টেকনোলজির কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

এবার চামড়া কারখানার দূষিত জল শোধনের পরিস্থিতি দেখা যাক। ভারতে চামড়া কারখানায় দূষিত পদার্থগুলির শোধনের কাজ NEERI ছাড়া Central Leather Research Institute মারফৎ করা হয়। দেশের এগারোটা চামড়া কারখানাতে সমীক্ষা করার পর NEERI নিজস্ব শোধন পদ্ধতি ঘোষণা করে। এতে প্রথমে ক্রোমিয়ামকে 'অ্যানারোবিক ফিল্টার' দিয়ে আলাদা করা হয় এবং অবশিষ্ট পদার্থগুলির 'এরোবিক ট্রিটমেণ্ট' করা হয়। অন্যদিকে 'ডাচ টেকনোলজি' কেবলমাত্র 'অ্যানারোবিক ট্রিটমেণ্ট'ই করেছে। হল্যাণ্ডে করা পরীক্ষায় জানা গেছে যে ট্যানিন-এর উপস্থিতিতে 'অ্যানারোবিক' প্রক্রিয়ায় মিথেন গ্যাস তৈরী করায় গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয়। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে চামড়া কারখানাগুলির বর্জিত পদার্থে ট্যানিনের মাত্রা বেশি থাকে। যেহেতু Dutch Technology জাজামউ, কানপুর আর মির্জাপুরে কেবলমাত্র 'অ্যানারোবিক' প্রক্রিয়াই কাজে লাগাবে অতএব চামড়া কারখানার দূষিত পদার্থগুলির শোধনে এই টেকনোলজির কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। বিশেষ করে জাজামউতে এই টেকনোলজি ব্যর্থ হবে, কারণ ওখানে চামড়া কারখানার বর্জিত পদার্থগুলিতে ট্যানিনের মাত্রা বেশি।

NEERI আজ অবধি 'শিল্পজাত ময়লা জল' (industrial waste water) শোধনের তিনশোটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার মধ্যে দুশোটি প্ল্যাণ্ট ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। ময়লা জল শোধনে NEERI-র পদ্ধতি বেশি উল্লেখযোগ্য, কেননা এগুলি ভারতে সুলভ অত্যাধিক সূর্যালোক এবং বেশি তাপমাত্রার কথা মাথায় রেখে বের করা হয়েছে। শক্তির সাশ্রয়ের জন্য এই পদ্ধতিটি প্রশংসা পেয়েছে। B. O. D. বা C. O. D-এর মাত্রাকে কমাতেও NEERI 'অ্যানারোবিক ফিল্টারের' কার্যকারিতা Dutch Technology-র অন্তর্গত U A S B-র কার্যকারিতার চেয়ে উঁচু মানের। 1982 সালে NEERI চামড়া কারখানার বর্জিত পদার্থগুলি শোধনের ক্ষেত্রে B. O. D., C. O. D. এবং ট্যানিনের মাত্রা কমানোয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। এবার 'নিরি' এরকমই দ্বিতীয় একটি প্ল্যাণ্ট দেওরাসের (মধ্যপ্রদেশ) চামড়া কারখানায় লাগাচ্ছে। আগ্রার একটি চামড়া কারখানায়ও 'নিরি'র এক শোধনযন্ত্র প্রদর্শনীমূলকভাবে কাজ করছে। ভারতে 'নিরি' বিভিন্ন 'অ্যানারোবিক রিঅ্যাক্টারে' কাজ করার পর 'স্লাজ ব্ল্যাঙ্কেটের' তুলনায় 'অ্যানারোবিক ফিল্টার'কেই ভারতীয় পরিস্থিতে বেশি উপযোগী দেখেছে। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত

নিতে পারি, ভারতীয় প্রযুক্তি এক্ষেত্রে 'ডাচ' প্রযুক্তির তুলনায় উন্নত।

এবার প্রশ্ন উঠছে যে এরকম বিতর্কিত পর্যায়ে এই প্রযুক্তি কেন আমদানি করা হচ্ছে? গঙ্গা প্রজেক্ট ডিরেক্টরেটের দলিলে বলা হয়েছে যে 'ডাচ টেকনোলজি' ভারতের 'টেকনোলজির' সঙ্গে মিলে কাজ করবে। তাহলে 'ডাচ' প্রযুক্তি এক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযুক্তির থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকেই বেছে নেয়া হলো?

আসলে ব্যাপারটার শুরু ফেব্রুয়ারী 1985-তে, যখন ভারত ও হল্যাণ্ডের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিতে পরিবেশ সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন্ বিশেষ ধরনের 'ডাচ' প্রযুক্তিকে এই বিশেষ কাজের জন্য আমদানি করা যায় এটা ঠিক করার জন্য একটি উচ্চস্তরের **fact finding mission** তৈরী হয়। এই মিশনে হাস্‌কোনিং কোম্পানীর কিছু ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। ফলে অবধারিত ভাবেই, হাস্‌কোনিং কোম্পানী নিজের তৈরী **U A S B** রিঅ্যাক্টারকেই নির্বাচিত করে।

এই পুরো খেলাটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সরকারের দোদুল্যমান মনোভাবই স্পষ্ট হয়, আর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয়। একদিকে সরকার স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিচ্ছে, আর অন্যদিকে এমন সব ক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তি আমদানি করছে যেখানে তার কোনো প্রয়োজনই নেই। আমাদের সরকার কি জানতো না যে মিশন যে রিঅ্যাক্টারের ব্যাপারে সুপারিশ করবে সেই রিঅ্যাক্টার যাঁরা তৈরী করেছেন তাঁরাই এই মিশনে আছেন? সরকার এই রিপোর্টগুলিকে কেন তার নিজস্ব সংস্থাগুলিতে মতামতের জন্য পাঠায় নি? সরকার কি এই তথ্য জানতো না যে রিঅ্যাক্টারের কার্যকারিতা তাপমাত্রার ওঠানামার সঙ্গে প্রভাবিত হয়? সব থেকে বড়ো প্রশ্ন, যদি এ ব্যাপারে বিদেশী সাহায্যই নেওয়ার পরিকল্পনা ছিলো তাহলে (একই বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য) NEERI-র পিছনে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা কেন খরচ করা হচ্ছে? স্বাধীনতার পর সরকার ক্রমাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বাবলম্বী হবার কথা বলছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ক্রমাগত এটাই দেখা যাচ্ছে যে বিদেশী প্রযুক্তি আর ঋণ দুটোকেই অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। যার ফলে স্বাবলম্বী হওয়া কথাটার কোনো অর্থই থাকছে না। যদি দেশে প্রযুক্তি অবিকশিত বা অনুপস্থিত থাকে অথচ তার খুব প্রয়োজন দেখা যায় তবে এভাবে বিদেশী সাহায্য নেওয়ার একটা অর্থ থাকে। কিন্তু যদি দেশেই প্রযুক্তি পাওয়া যায় এবং তা বিদেশী প্রযুক্তির চেয়ে উন্নত হয়, তাহলে এভাবে প্রযুক্তি আমদানি করার সিদ্ধান্ত শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, রহস্যজনকও বটে।

[**উষা মেনন** (দিল্লী)-এর স্টাডি রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত **অরুণ সিংহ** ('একলব্য', ভূপাল)-এর নিবন্ধ সামান্য সম্পাদনা করে অনুবাদ করেছে **সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়**।]

ভেজাল তেলে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে একটি ছোট সমীক্ষা। এমন কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যেগুলির সূত্র ধরে আরো অনুসন্ধান ও ব্যাপক গবেষণা দরকার।

বেহালা : তেল কেলেঙ্কারীর এক বছর

উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

1988 সালের জুলাই মাসে প্রায় সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে ছিল বেহালার তেল কেলেঙ্কারী সম্পর্কিত ঘটনাবলী। সুসভ্য গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের কতিপয় নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন এই ভেজাল তেলের খাবার খেয়ে। এই আক্রমণের গতি এমনই ভয়ানক ছিল যে, যাঁরা এই তেল ব্যবহৃত কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। বেশীর ভাগেরই চাকরি যায়, এবং অদ্যাবধি তাঁরা বেকার। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের চিকিৎসা, সরকারী সাহায্য ও শারীরিক উন্নতি বিষয়ক যেসব তথ্য আমাদের কাছে সংবাদ মাধ্যমগুলির থেকে আসছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ভেজাল তেলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে গিয়েছিলাম তাঁদের এখনকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে ও পর্যালোচনা করতে। এই উদ্দেশ্যে মোট 65 টি পরিবারে (প্রায় 300 জন ব্যক্তি) পরিকল্পিত সমীক্ষা চালাই এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সাথে পরিচিত হই, যার দুএকটির দৃষ্টান্ত এই নিবন্ধে তুলে ধরা গেল।

প্রথমেই একথা স্বীকার্য যে, সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রোগীদের সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভিত্তিতে, তাই পর্যালোচনায় ব্যক্তিগত ধারণার প্রভাব অনুপস্থিত নয়। অতএব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হবার অবকাশ থাকতে পারে।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু রোগীরা দু'ভাবে ভেজাল তেলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভেজাল তেল প্রথম গ্রহণ করেছিলেন যেসব ব্যক্তি, তাঁরা 'গরীব ভাণ্ডার' নামক রেশন দোকান থেকে তেল নিয়েছিলেন ও সেই তেল দিয়ে রান্না করেছিলেন। এঁদের সবারই প্রথমে খাদ্য বিস্বাদ বা তেতো লেগেছিল ও পরে সেইদিনই বারংবার পায়খানা ও বমি হয়েছিল। যাঁদের পায়খানা ও বমি কয়েকদিন ধরে অতিরিক্ত পরিমাণে হয়েছিল, বিচারে দেখা গেছে তাঁদেরই পক্ষাঘাতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃতভাবে কম। অন্যদিকে যাঁদের এইটুটি একেবারেই হয়নি, তাঁরা প্রাথমিক ভাবে সুস্থ থাকলেও, পরবর্তীকালে ভয়াবহ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন।

ভেজাল তেলে পরের দিকে সবচেয়ে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন

যেসব ব্যক্তি তাঁরা স্থানীয় একটি দোকান থেকে তেলেভাজা, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খেয়েছিলেন। এছাড়া 'বোঁদে' জাতীয় ভাজা মিষ্টি ও দোকানের পরোটা খেয়েও অনেকে অসুস্থ হয়েছিলেন। মূলত এই ভেজাল তেল 'গরীব ভাণ্ডার' নামক রেশন দোকান থেকে পাওয়া গেলেও, রথযাত্রার সময়ে আঞ্চলিক মেলায় এই তেল বহুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় উপায়ে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এই ভেজাল তেলের প্রাথমিক লক্ষণ পায়খানা ও বমি হলেও প্রথম দিকে সাধারণ diarrhoea-র ওষুধ খেয়ে অনেকেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। প্রায় সবাই স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে শুরু করেন। পরবর্তী লক্ষণ প্রকাশিত হয় দেড় থেকে দুই সপ্তাহ পরে। এই লক্ষণের প্রথম পরিচয় ছিল হাতে ও পায়ে জোর কমে যাওয়া এবং কালক্রমে অবশ হয়ে যাওয়া। আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন ও স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শিশুরা। দু-চারজন শিশু ব্যতিরেকে প্রায় কেউই সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী বা পঙ্গু হয়নি। এদের নিত্যকার চঞ্চলতা কিছুটা ব্যাহত হলেও, কার্যত এরা সুস্থই ছিল।

ভেজাল তেলে আক্রান্ত ব্যক্তিরা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর যখন সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এই তেলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকলো, তখন বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল-গুলিতে আলাদা ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এগিয়ে আসেন সরকারী সহযোগিতা নিয়ে।

এই রকম পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট রোগী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখা দেয়। এই সঙ্কটটি চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কিত। বেশীর ভাগ রোগী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের পরামর্শমত সরকারী হাসপাতালে 'এ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসার জন্য যান ও সেখানে ভর্তি হন। কিন্তু দু'একটি পরিবার এর ব্যতিক্রম ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেখ তাফাজ্জল আলম ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। এঁরা প্রথম থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এঁরা কিছুদিনের জন্যও 'এ্যালোপ্যাথি' করাননি। এই পরিবারের প্রায় সব সদস্যই এখন সুস্থ। তাফাজ্জল আলম নিজে উদ্যোগ নিয়ে স্থানীয় কিছু আক্রান্ত ব্যক্তিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে সচেষ্ট হন। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এতে বাধা দেন ও রোগীদের প্রাথমিকভাবে 'এ্যালোপ্যাথি' করাতে বাধ্য করেন। পরে যখন 'এ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসায় বিশেষ কোন সুফল পাওয়া গেলনা ও হোমিওপ্যাথিতে সুফল মিলল, তখন এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষই শেখ তাফাজ্জল আলমের কাছে রোগীদের নিয়ে এলেন হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার জন্য। তবে 'এ্যালোপ্যাথি' একেবারে বন্ধ রইলো না। পাশাপাশি দুই ধারার চিকিৎসা চলতে লাগলো। এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি আগে প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে আসতেন, এখন মাসে একটি বা দুটি দিন আসেন।

ইনি মূলত যে চারটি ওষুধ ব্যবহার করেছেন, সেগুলি হ'ল 'Rhustox 30', 'Arnica-30', 'Curear-30' এবং 'Corticum-30'। 'এ্যালো-প্যাথি' চিকিৎসায় প্রথম দিকে ভিটামিন ইনজেকশন ও পরের দিকে ভিটামিন ট্যাবলেট ব্যবহৃত হয়। মূলত নিউরোবিয়ন ইনজেকশন ও পলিবিয়ন ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়। এই পলিবিয়ন ট্যাবলেটে ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স ও ভিটামিন 'সি' যুক্ত আছে।

যাঁরা প্রথম থেকে অথবা অল্প কিছুদিন পর থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন, তাঁরা অনেকেই প্রায় সুস্থ হয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে যাঁরা দীর্ঘদিন 'এ্যালোপ্যাথির' উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা আজও বহুলাংশে পঙ্গু ও অক্ষম।

রোগীদের দ্রুত উন্নতি বিধানের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি 'পেসেন্টস্ ওয়েলফেয়ার কমিটি' করেছেন। এই কমিটির সভাপতি মহঃ বারসেদ আলি। সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে শ্রী শশধর পাত্র ও শেখ তাফাজ্জল আলম। মহঃ বারসেদ আলি নিজে আইনজীবী। ইনি আইনগত বিষয়গুলির পর্যালোচনা করেন ও পরামর্শ দেন। কার্যত সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করেন শেখ তাফাজ্জল আলম। শ্রী আলম পূর্বে 'থার্মোসেট-ইণ্ডিয়া'য় সুপারভাইজার পদে কাজ করতেন। ভেজাল তেলে আক্রান্ত হবার পর থেকে অদ্যাবধি ইনি বেকার। শ্রী আলম তাঁর কর্মহীন জীবনকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাচ্ছেন রোগীদের উন্নতি বিধানে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ রোগী অবধি সকলেই এঁর উপর অত্যন্ত নির্ভর করেন। বর্তমান প্রতিবেদক নিজের চোখে এই ব্যক্তিকে রোগীদের সাহায্যার্থে সমস্ত রকম কাজ করতে দেখেছে। সরকারী অর্থও শ্রী আলম নিজে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

সরকারী অর্থ সাহায্য পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়। পরিবারের এক ও দুজন সদস্যের জন্য 100 টাকা, তিন জনের জন্য 200 টাকা এবং চার ও অধিক জনের জন্য 300 টাকা মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া পরিবারে বড়দের মাথাপিছু 12 কেজি ক'রে ও শিশুদের মাথাপিছু 6 কেজি করে চাল প্রতি মাসে দেওয়া হয়। এই সরকারী সাহায্য এখন অবধি নিয়মিতই দেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা ও সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে কিন্তু বিতর্কিত দৃষ্টান্তও আছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলেন 75 বছরের এক বৃদ্ধা। যদিও ইনি ভেজাল তেলের রোগী হিসেবে স্বীকৃত ও সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন, তবু চিকিৎসকরা ও স্থানীয় ব্যক্তিরা এঁকে ভেজাল তেলের রোগী বলে মনে করেন না। ইনি বহুদিনের বাতের রোগী। এঁর পায়ের অবশতা বাতের ফলেই ঘটেছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই বৃদ্ধা মহিলার হাতে কোন রকম অসুবিধে কখনো হয়নি।

অসংখ্য হতাশা উদ্রেককারী পরিস্থিতির মধ্যেও একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হ'ল শ্রীমতী আশা দাস। এই অল্পবয়স্কা মেয়েটি আজন্ম মানসিক ও শারীরিকভাবে অস্বাভাবিক। এই মেয়েটি আগে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারতো না, কথা জড়িয়ে যেত। ভেজাল তেলে আক্রান্ত

হবার পর এই মেয়েটি পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হবার পরিবর্তে মানসিক ও শারীরিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে গেছে! এখন ও পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে।

পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শ্রী অজিত হালদার রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। এই ব্যক্তি পূর্বে মদের নেশা করতেন। গুরুতরভাবে আক্রান্ত হবার পরেও ইনি মদ ছাড়েননি (স্থানীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন যে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে মদ্যপায়ী রোগীদের কাছে, ভাঁড়ে ক'রে মদ যেত)। এই ব্যক্তি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও পূর্বের কাজে স্বাভাবিকতার সাথে কর্মরত। এঁর ধারণা এঁর সুস্থতার কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান। সাধারণ কিছু মদ্যপায়ী এঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থাতে মদ্যপানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে এঁদের মধ্যে অনেকেই অন্যদের তুলনায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। স্থানীয় ব্যক্তিরা এই ঘটনাকে 'ককটেল-প্যাথি' ব'লে রসিকতা করেন।

সম্প্রতি কিছু সংবাদপত্রে এই রোগীদের শারীরিক উন্নতি ও সরকারী সহায়তা বিষয়ক কিছু হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের উপস্থাপনা করা হয়েছিল, যা সর্বতোভাবে সঠিক নয়। রোগীরা বিক্ষুব্ধ, তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ নন, তাঁরা আরো সাহায্য ন্যায্যভাবেই দাবী করেন—এ সব কথাই ঠিক। কিন্তু একথাও প্রকাশ না করা অনুচিত হবে যে সরকার রোগীদের সাথে সাধ্যমত সহায়তা করছেন। সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন রোগীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল—রোগীদের অনেকে একথা অস্বীকার করেন না। তবে আর একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে, নকুল সাউ ('গরীব ভাণ্ডারে'র মালিক) এখন জামিনে মুক্ত। পৃথিবীর বৃহত্তম "গণতন্ত্র" এই শয়তানটিকে আজও কোন শাস্তি দিতে পারেনি। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্র এত অসহায়—একথা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য?

সিলিকোসিস : মৃত্যু-মিছিল

ভারতের স্কুল-গমন-বয়সী লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের লেখার সামগ্রী স্লেট পেন্সিল। এই অবোধ ছেলেমেয়েরা জানে না তাদের হাতে লেখার উপকরণ তুলে দিতে আর এক শ্রেণীর মানুষকে কতখানি মূল্য দিতে হচ্ছে।

ভারতের মধ্যপ্রদেশর মন্দসাউর জেলায় রয়েছে তিরিশটি স্লেট খনি এবং পঁচাশিটি স্লেট পেনসিল কারখানা। শ্রমিকদের একটা বিপুল অংশ মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে থেকেই নেয়া হয়। এই দুই শিল্পে এখানে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুশ্রমিক মিলিয়ে মোট ছয় হাজার জন কাজ করে। যেসব শিশু ও কিশোর এই শিল্প কারখানায় কাজ করছে তারা ক্রীতদাসের চাইতেও অধম, প্রতিনিয়ত চরম অমানবিক শোষণের শিকার হচ্ছে। শিল্প কারখানার মালিকরা ধনী, রাজনৈতিক টাউট পরিবেষ্টিত। তাই তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। অস্থি চর্মসার চোদ্দ বছর বয়সের এক কিশোর বলেছে—আট দিন কাজ করে সে একদিনের পয়সা পায়। তাদের প্রায়শই মারধোর করা হয়। তার কর্মক্ষেত্রটি (স্লেট কারখানা) ছোট এবং নোংরা। তাকে সকালবেলা কেবলমাত্র এক কাপ চা এবং দুপুরে দেড়টুকরো পাতলা আটার রুটি এবং সামান্য সব্জী খেতে দেওয়া হয়।

নানুরাম তেলি, 65 বৎসরের এক বৃদ্ধ, তার স্ত্রী নানীবাঈ: ওদের 4টি সন্তান—রঘুনাথ (40), রামচন্দ্র (35), দয়ারাম (32) এবং কেশিমল (30)—স্লেট কারখানায় চাকরী করে জীবন খুইয়েছে। চারজনই বিবাহিত ছিল। বিধবা বধূদের দুজন পরে আবার বিয়ে করে। অন্য দুজন এখন একই কারখানায় স্লেট পেন্সিল তৈরীর কাজ করছে।

কান্নামাখা গলায় বিধবা লক্ষ্মীবাঈ বলে, "আমি প্রতিদিন 3 হাজার পেন্সিল তৈরী করি এবং দৈনিক 7 ঘণ্টা অমানবিক পরিবেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাত্র 3 টাকা পাই।" লক্ষ্মীবাঈ এখন সেই একই কারখানায় কাজ করছে—যে পরিবেশ তার স্বামীর জীবন অকালে ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতে 20 লক্ষ মানুষ প্রতিদিন এই সিলিকাধূম্রমণ্ডিত পরিবেশে কাজ করছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ টেনে নিচ্ছে,—ধীরে ধীরে কষ্টকর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বহিরাগত কেউ মন্দসাউর-এর কোন গ্রামে গেলে দুটি জিনিস তার চোখে ধরা পড়বেই: (1) সারি সারি কবর এবং (2) কবরের নাম-ফলক পড়লে জানা যাবে মৃতদের অধিকাংশই তরুণ। কেউই 40 বছরের প্রান্তসীমায় পৌছায় নি।

কেন এই মৃত্যু-মিছিল ॥

ডাক্তাররা বলে ওরা সিলিকোসিস (Silicosis) নামক এক ধরনের রোগে আক্রান্ত,—যা নিরাময়যোগ্য নয়। গ্রামের অধিকাংশ শিশুও (তারা কারখানায় কাজ করুক আর না করুক) ঐ শ্বাসতন্ত্রীয় সমস্যায় ভুগছে। কঠোর শ্রম আর বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে দৈনিক পাঁচ থেকে দশ হাজার স্লেট পেন্সিল তৈরী করা হয়। এই স্লেট তৈরীর জন্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় খয়েরী রংয়ের মসৃণ পাথর। বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে ঐ পাথর রুটির স্লাইসের মত পাতলা খণ্ডে কাটা হয়। যান্ত্রিক করাতে ঐ পথর কাটার সময় স্খলিত চূর্ণগুলো ধুলোর আকারে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং আশপাশে যারা থাকে ঐ ধুলোময় পাথর চূর্ণ তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে টেনে নেয়।

এর ফলে যক্ষ্মার মত এক ধরনের ফুসফুসের রোগ, সিলিকোসিস অথবা নিউমোকনিমোসিস-এর সৃষ্টি হয়। যক্ষ্মার সঙ্গে এর তফাৎ, এটি যক্ষ্মার

চেয়েও মারাত্মক। সিলিকোসিসে আক্রান্ত হবার পর মাত্র 6 সপ্তাহের শুকনো কাশি এবং শ্বাসকষ্টই একজন স্বাস্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

স্লেট কারখানায় কাজ শুরুর 6 মাসের মধ্যে একজন শ্রমিক ক্রমাগত সর্দি ও কাশির শিকার হয়। আরো 18 মাস একই পরিবেশে কাজ করার পর তার কাশি আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা আরম্ভ হয়। এই সব উপসর্গ অনেকটাই যক্ষ্মার মত—তবে এ রোগে মৃত্যু অনেক বেশী যন্ত্রণাময় ও দ্রুত।

"উদ্বেগে আকুল" রাজনৈতিক নেতা, ক্ষতিপূরণের আইন-কানুন, হতভাগ্য শ্রমিক ।।

রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্দসাউরের ভাগ্যপীড়িত মানুষগুলোর জন্য। তবে এসব উদ্বেগ-ব্যাকুলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতাদের মুখে প্রকাশ পায় নির্বাচনের সময়। সকলেই এই ঘটনার ফায়দা লুটতে চায়···আবেগতাড়িত ভাষণ দেয়···কিন্তু শ্রমিকদের কষ্টকর জীবন ও মৃত্যু মিছিলের মতই এগিয়ে চলে। বিভিন্ন সমাজ-কর্মীরাও শিল্প ও স্বাস্থ্য বিভাগের, শ্রম ও সমবায় মন্ত্রীদের নিন্দা করেছেন দ্বিধাহীন ভাষায়।

কারখানা আইন 1946 এবং খনি আইন 1952 অনুযায়ী ভারত সরকার সিলিকোসিসকে মারাত্মক পেশাগত রোগ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই আইনে বলা হয় কোনো শ্রমিক এই রোগের শিকার হয়ে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী তথা পোষ্যরা ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। এই আইনটি 1959 সালের জুন মাসে বলবৎ হলেও সংগঠিত খনি শ্রমিকরা ছাড়া অন্য কেউ এই আইনের সুবিধা পায়নি। মলিকপক্ষও চতুরতার সঙ্গে ছড়ান ছিটান অবস্থায় গড়ে তোলেন ছোট ছোট স্লেট পেন্সিল কারখানা এবং এটা কুটির শিল্পের অবয়বে গড়ে ওঠায় শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার (ইউনিয়নভুক্ত) সুযোগ পান না। ফলে সংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের সুযোগগুলোই গ্রহণ করতে পারেন না।

রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী আমলাদের মতে, মৃত ব্যক্তি যে সত্যিই সিলিকোসিসে মারা গেছেন, একজন ডাক্তারকে এই মর্মে নিশ্চয়তা তথা প্রত্যয়ন পত্র দিতে হবে, শুধুমাত্র সিলিকোসিস সন্দেহ করলেই চলবে না। আইনের এই ফাঁক দিয়ে টাকার জোরে মালিকপক্ষ সহজেই পার পেয়ে যায়।

সিলিকোসিসে মৃত শ্রমিক-এর পরিবার প্রমাণ পত্রসহ ক্ষতিপূরণের জন্য এক বছরের মধ্যে দরখাস্ত করলেই ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। এমন কি মন্দসাউরের শ্রম কর্মকর্তাই 10 হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিতে পারেন। কিন্তু এসব নিয়ম মন্দসাউরের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না। কারণ শ্রম কর্মকর্তার অফিস ক্ষতিপূরণের দাবীদারদের নাম তালিকাভুক্ত করে না কোনো এক অদৃশ্য হাতের খেলায়। বিভিন্ন শ্রম সংস্থাগুলোও রহস্যপূর্ণ-ভাবেই এসব ব্যাপারে কেমন যেন উদাসীন।

তাই হতভাগ্য মন্দসাউরের স্লেট শ্রমিকরা স্লেট পেন্সিল তৈরী করলেও ওদের বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে-খড়ি হয় না অর্থাভাবে। রোগ-যন্ত্রণা আর মৃত্যু ওদের নিত্যসঙ্গী। এক চরম নিরাপত্তাহীনতা আর অসহায় অবস্থার মধ্যে শোষিত অবহেলিত জীবন নিয়ে দিন কাটাচ্ছে মন্দসাউর জেলার হাজার হাজার পুরুষ মহিলা আর শিশু।

মূল রচনাটির লেখক এস চক্রপানি। এশিয়ান এনভিরনমেন্ট-এ প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরাজীতে। বঙ্গানুবাদ বের হয় গণস্বাস্থ্য পত্রিকার এপ্রিল-মে 1985 সংখ্যায়, ঐ বঙ্গানুবাদের নির্বাচিত অংশ নিয়ে সংকলিত বর্তমান নিবন্ধটি।

সংকলক—**শান্তনু ত্রিবেদী**

আলোচনাচক্রে যোগ দিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিসেফ আয়োজিত সেমিনার

স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞানের মিথষ্ক্রিয়া

(Interaction of Health & Social Sciences)

নভেম্বর 25 ও 26, 1989

রেজিস্ট্রেশন ফি : ব্যক্তি 25 ; সংগঠন প্রতিনিধি 20 ; ছাত্র 10 টাকা

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ : 16 অক্টোবর, 1989

বিশেষ অতিথি : দেববর ব্যানার্জি, জাফরুল্লাহ চৌধুরী, মীরা শিভা, বি ইকবাল, কার্ল এরিখ নুটসন, দীনেশ আব্রল প্রমুখ।

যোগাযোগ : স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞান সেমিনার কমিটি, ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন
244 বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-20

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা : সাধারণ সভা

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ল গত 29শে জুন, বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা অবধি রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের হলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট 62 জন, তবে সকলেই সংস্থার সভ্য নন।

দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের পর সম্পাদক শান্তনু ত্রিবেদী তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন অনেকে।

সুপর্ণ চৌধুরী আগামী গণবিজ্ঞান সম্মেলনে সংস্থার ভূমিকা ও বক্তব্য কী হওয়া উচিত তা আলোচনার অনুরোধ রাখেন।

আশিস মুখার্জি কার্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব রাখেন, যাতে সম্পাদকের প্রস্তাবগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা যায়। সত্যব্রত কর বলেন —এ বছর সাধারণ সভার চেহারা একটু অন্য রকম। এবারে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সভ্য তথা "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকার কর্মীরা ছাড়াও পত্রিকার কাছের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাও উপস্থিত আছেন। আমাদের একটু ব্যাখ্যা করে বলা উচিত আমরা কী কী করতে চাইছি। শুধু পত্রিকা চালানো নয়, আরও কিছু কাজ করার বাসনা তো আমাদের আছে, কিন্তু করে উঠতে পারছি না। সে সব পরিষ্কার বলা উচিত, তেমনি বন্ধুদেরও বলা উচিত তাঁরা কি করছেন এবং আমাদের কাছেই বা তাঁরা কি আশা করেন।

সভাপতি মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বলেন, আজকের সভায় উপস্থিত সকলে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার (Scientfic Workers' Forum —SWF) প্রেক্ষাপট নাও জানতে পারেন, তাঁদের সেটা একটু বলা দরকার। SWF 1973 সালে গড়ে ওঠে, পরে 1977 থেকে সংগঠন রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। এই বক্তব্যেরই জের টেনে রবীন মজুমদার বলেন, আমাদের গৃহীত সংজ্ঞানুযায়ী, বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তিই বিজ্ঞানকর্মী। গোড়ায় অবশ্য প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিই বেশি ছিলেন, এবং সে সময় একটা বিতর্ক উঠেছিল, আমাদের সংস্থা কি বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের মত হবে, না বিজ্ঞানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়েই চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম করবে। ক্রমে আমরা দ্বিতীয় কাজের দিকেই ঝুঁকেছি, এবং এখন তো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংগঠন, আমাদের মত করেই ভাবছে, কাজ করছে, সংগঠিত হ'চ্ছে। যেমন, ওষুধ শিল্পের সমস্যা নিয়ে বা পারমাণবিক চুল্লির বিরুদ্ধে লেখা "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকায় প্রথম থেকেই বেরোতে থাকে। এখন এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন সক্রিয় আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। নতুন শব্দ এসেছে 'গণবিজ্ঞান' তার চেহারা, চিন্তা, পরিধি নিয়ে অনেকেই ভাবছেন পঁচাশির পর থেকে।

সৌমেন গুহও স্মৃতিচারণা করেন—SWF তো প্রথমে, বলতে গেলে মূলত বিজ্ঞানীদের অসন্তোষ প্রকাশের জায়গা ছিল। একটা ভালো ব্যাপার হতো তখন—প্রচুর সেমিনার হতো। তাতে বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠতো। বর্তমানে সংস্থা সেই ব্যবস্থাটি হারিয়েছে। এর পর তৈরি হ'ল 'জ্যাকারী'। অনেক বন্ধুই সেখানে কাজ করাটা পছন্দ করলেন এবং আমরা একটু 'তরল-প্রকৃতির' বিজ্ঞান চর্চা শুরু করলাম। ফলে (বিওবি'তে) লেখার ধরন ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বাধীনতা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সতর্ক ও সাবধানী ভঙ্গিটি নষ্ট হয়ে গেল, লেখা ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে। 1982'র ছয়ই আগস্ট 'ব্ল্যাক ডে'-তে যে মিছিল হ'লো, তাতে এমন কিছু সংগঠনের সাথে দেখা হ'লো যারা প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার ধারে কাছেও ছিল না। 'কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে টেবিল পেতে পত্রিকা বিক্রি কেন করি না, আমরা ? কেন আমরা ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক তুলতে পারবো না ?'—প্রশ্ন রাখেন সৌমেন।

সভাপতি মণিবাবু জানালেন, এক সময় SWF সরকারের কাছ থেকে কিছু অনুদান পেয়ে স্লাইড তৈরি করেছিল, প্রোজেক্টর, মাইক্রোসকোপ এসব কিনেছিল। দু তিনটে ভিডিও ফিল্মের টেপও আমাদের আছে, এক সময় বিভিন্ন সংগঠন এগুলো নিয়ে যেত, দেখাতো। এখন এ কাজের ধারা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সুখময় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন—বাস্তব পরিস্থিতি বোধহয় স্বীকার করা ভালো যে এই সংস্থায় ও পত্রিকায় যাঁরা কর্মী, তাঁরা বোধহয় একটু প্রবীণ এবং ক্লান্তও বটে। নতুন প্রজন্মের কর্মী না হ'লে কাজ চালানো শক্ত হবে। তিনি পত্রিকার প্রচার ও আর্থিক অবস্থার কথা জানতে চান।

অভিজিৎ লাহিড়ী উত্তরে জানান—পত্রিকা ছাপা হয় এগারোশো। টিম টিম করে চলছে, এর যেন কোনো প্রাণশক্তি নেই,..... । সুখময়বাবু সরকারি অর্থ সাহায্য চাইবার প্রস্তাব দেন, মেঘনাদ তাঁকে সমর্থন করে বলেন, সরকারি পয়সা তো প্রকারান্তরে জনসাধারণেরই পয়সা, নিতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত পত্রিকায় আরও প্রাঞ্জল লেখা ছাপানোর কথা বলেন। পূরবী ঘোষ তাঁকে সমর্থন করে বলেন, বি-ও-বি. পত্রিকার লেখাগুলো যেন বিশেষভাবেই কেতাবি বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিতদেরই একাংশের জন্য। কিন্তু সমাজ সচেতন সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌছানো যদি পরিচালকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হয়, তাহ'লে প্রকাশিত লেখার সহজবোধ্যতার দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও একথা মাথার রাখলে বোধহয় ভালো হয়। নতুন একটি কার্যকরী সমিতিসভাতেই গঠিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। বেশ কয়েকজন তরুণ কর্মী কার্যকরী সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। পূর্বতন হিসাব পরীক্ষক সংস্থাই এবছরও হিসাব-পরীক্ষার জন্য

মনোনীত হয়। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনজনের নামও সভায় গৃহীত হয়।

উড়িষ্যার শস্য ভাণ্ডার বালিয়াপাল-ভোগরাই অঞ্চলকে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে পরিণত করার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, তাকে রুখে দিতে বালিয়াপালের জনগণ মরণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেই আন্দোলনের ঢেউয়ের শব্দ শোনা গেল "ভয়েসেস ফ্রম বালিয়াপাল" নামের ভিডিও প্রদর্শনীতে—বার্ষিক সাধারণ সভার শেষের দিকে।

সবশেষে অনুষ্ঠিত হোলো মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি প্রযোজিত 'যাযাবর নাট্যগোষ্ঠীর' নাটক "কিছু মনে করবেন না!"

পূরবী ঘোষ

গাছ কাটুন, আইন মানুন

রাজস্থানের ঊষর আরাবল্লি পাহাড়ের সানুতে সারিসকা (রাজীব গান্ধী খ্যাত) অভয়ারণ্যের কাছে আলোয়ার জেলার গোপালপুর গ্রাম। 1987-র জুনে "তরুণ ভারত সঙ্ঘ" নামে একটি সংগঠনের সাহায্যে এবং উৎসাহে এই গ্রামের লোকজন পাহাড়ের পাথুরে ঢালুতে বন বানাবার কাজে মাতে। প্রত্যেক বাড়ীর একজন একটা করে চারা বোনে। উটের গাড়ীতে করে জল নিয়ে যায়। নিজেরা নিজেদের জন্যে আইন বানায়। এখন সেখানে দিব্যি একটা বন হয়েছে।

কিন্তু আলোয়ারের জিলা-তহশিলদার গোপালপুর গ্রামের লোকজনের ওপর 4950টাকার জরিমানা ধরিয়েছেন, কারণ তাঁরা পাহাড়ের সানুতে সরকারী জমিতে সরকারের বিনা অনুমতিতে গাছ বুনেছেন। "তরুণ ভারত সঙ্ঘ"-কেও এই জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—জিলাশাসক এই বেআইনী গাছ কেটে সব বন্ধ্যা সরকারি জমিকে আবার বন্ধ্যা করে ফেলবেন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারি জমিতে বেআইনী গাছ থাকতে দেয়া হবে না,—এটাই নাকি আইন। গোপালপুর গ্রামের লোকজন এখন বাড়ি ঘর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে তাঁদের বানানো বন সামলাচ্ছেন—পুলিশ আসুক, তাঁরা জানে না মরে গাছ মারতে দেবেন না।

সূত্র: প্রতিক্ষণ, 17 জুলাই-1 আগষ্ট, '89

শান্তনু ত্রিবেদী

ঠোঁট রাঙানোর বিপদ

কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব পেনাং-এর এক সতর্কবাণীতে প্রকাশ, লিপস্টিকে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্মবৈকল্যেরও কারণ হতে পারে। বহু ব্র্যাণ্ডের লিপস্টিকে 'রোডামিন বি' নামে যে রং ব্যবহার করা হয় তা ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন। 'ব্রিলিয়ান্ট ব্লু' নামে আর এক রকমের বিষাক্ত রঙও অনেক লিপস্টিকে থাকে। চামড়ার ক্যানসার সৃষ্টির সঙ্গে এই রঙটি জড়িত।

চুমু খাবার পরও ঠোঁটের কৃত্রিম রঙ যাতে উঠে না যায়, সেজন্যে আজকাল এমন কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে লিপস্টিকের রঙ ঠোঁটের পাতলা আবরণ ভেদ ক'রে ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। আর, অনেক সময় অনেকে যে ঠোঁটের রঙও চেটেপুটে খেয়ে ফেলেন তা তো সকলেরই জানা।

সূত্র: মাসিক গণস্বাস্থ্য, আষাঢ় 1391, পৃ: 47

ডিটারজেন্ট ব্যবহারের মাশুল

একনাগাড়ে অনেকদিন ধ'রে কৃত্রিম গুঁড়ো সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করার ফলে জাপানের 4লক্ষ 25 হাজার লোক তীব্র একজিমা ও অন্যান্য চর্মরোগের শিকার হয়েছেন। মে 1979 থেকে মার্চ 1982 পর্যন্ত সময়ে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন জাপানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। 20 থেকে 40 বছর বয়সের গৃহবধূরাই ডিটারজেন্ট-জনিত চর্মরোগে বেশি ক'রে ভুগছেন।

সূত্র: মাসিক গণস্বাস্থ্য, অগ্রহায়ণ 1391, পৃ: 47

সুদীপ্ত সরস্বতী

['সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : শিক্ষা ও শিক্ষিত'—'টিকা ও নির্দেশিকা'র শেষ অংশ ; পৃ: 8 দ্রষ্টব্য]

millan, Bombay, 1956, পৃ. 181.

26. Nurullah and Naik : উপরোল্লিখিত, পৃ. 270.
27. Bhattacharya, Vidhushekhara : *Buddhist Texts as recommended by Asoka*, University of Calcutta, 1948 গ্রন্থটিতে এর সম্ভাব্য পরিচিতি।
28. **অর্থশাস্ত্র** : 1.3.1.
29. শূদ্রদের জন্যেই 'বার্তা (চাষবাস ইত্যাদি) কারুকুশীলবকর্ম (হস্তশিল্প ও সংগীত)।' **অর্থশাস্ত্র** : 1.3.1.
30. **মনুস্মৃতি** : 4.123 (এবং মেধাতিথিভাষ্য)।
31. ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এই পঞ্চমবেদ জন্মের দীর্ঘ কিংবদন্তী দিয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।
32. Jowett (tr) : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 322-25.
33. **কামসূত্র** : 4.8 (এবং জয়মঙ্গলা টীকা)।
34. **শুক্রনীতি** : 4.3.51-52.
35. **শুক্রনীতি** : 4.5.27-28.
36. ওমরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গণিতগ্রন্থের অংশবিশেষ : Midonick, Henrietta (ed.) : *The Treasury of Mathematics*, Vol. 2, Penguin, Harmondsworth, 1968, পৃ. 62-76.
37. Midonick (ed.) : উপরোল্লিখিত, পৃ. 178-79.
38. Whittaker, E. T. and G. Robinson : *The Calculus of Observations*, Blackie, London, 1932 গ্রন্থের মুখবন্ধ।
39. Bloomfield, Morton W. and Edwin W. Robbins (ed.) : *Form and Idea*, Macmillan, New York, 1961 গ্রন্থে Bertrand Russell-এর প্রবন্ধ ' "Useless" Knowledge', পৃ. 381 (প্রবন্ধটি *In Praise of Idleness and Other Essays* গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত)।
40. Richter, Jean Paul (comp. & ed.) : *The Notebooks of Leonardo da Vinci*, Dover, New York, Vol. I, 1970, পৃ. 14-15.
41. নিবন্ধটিতে দিতে হয়েছে প্রায়শই 'শিক্ষিত' বা 'পণ্ডিত' সম্প্রদায়ের চালু কাঠামো ও সান্ধ্যভাষা। এই ভেক ধরে আলোচ্য উপ-শ্রেণীর কাছে পৌছনো। না অন্য সভ্য-পন্থা! 'অশিক্ষিতরা' এ নিবন্ধটি পড়বে বলে, লেখা হয়নি।
42. Basu, Partha, Kajal Lahiri and Amlan Datta : *Report on the Economics of Education in some West Bengal Colleges with special reference to size, technique and location*, World Press, Calcutta, 1974.
43. **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী**, দ্বিতীয় ভাগ, চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, কলিকাতা, 1931, গ্রন্থে 'নব্য চীন ও বাঙালী'।
44. সামাজিক-আর্থনীতিক ক্ষমতার কথা বাদ দিলেও, মনন বা সংস্কৃতির ক্ষমতার প্রশ্ন না তুললেও—শিক্ষা-নামক বিষয়টির পরিসংখ্যানেই এ পিরামিডটি সুস্পষ্ট। যতো 'শিক্ষা'—ততো কম সংখ্যা। ঠিক যেমন : যতো অর্থশালী—ততো কম সংখ্যা!
45. দ্রষ্টব্য : Marx, Karl : *Theories of Surplus Value*, Lawrence & Wishart, London, 1951, পৃ. 177-97. "For example, Milton, who wrote *Paradise Lost*, was an unproductive worker. On the other hand, the writer who turns out factory-made stuff for his publisher is a productive worker." পৃ. 186.
46. Blaug, M. (ed.) : *Economics of Education 1*, প্রথম প্রকাশ 1968, ELBS & Penguin, Harmondsworth, 1971 এবং *Economics of Education 2, selected readings*, প্রথম প্রকাশ 1969, Penguin, Harmondsworth, 1970 গ্রন্থে সংকলিত।
47. Schultz, T. W. : 'Investment in Human Capital', *American Economic Review*, Vol. 51 (1961), পুনর্মুদ্রিত ; Blaug : *Economics of Education 1*, পৃ. 13-33.
48. Basu, Lahiri and Datta : পূর্বোল্লিখিত, মুখবন্ধ। উল্লেখ্য : "...the teachers in educational establishments may be mere wage workers for the *enterpreneur* of the establishments ; many such educational factories exist in England." Marx : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 195. খুব সম্প্রতি প্রকাশিত Devi, Sailabala : *Economics of Higher Education*, Anu, Meerut, 1988 গবেষণা গ্রন্থে ভারতের (মূলত ওড়িশার) শিক্ষাচিত্রে আর্থনীতিক নগ্নতার নানা বিশ্লেষণ। লেখিকা বারবার দেখিয়েছে—উচ্চশিক্ষার পরোক্ষ উপকার (সমাজ ইত্যাদি) হিসেবে আনা যায় না। লেনদেনটা নিছক টাকাপয়সার নগদ হিসেব। লক্ষ্যণীয় : "Higher education has little impact on the students to foster a feeling of national service and welfare activities in the society,...In Orissa higher education has not led to widening of the intellectual horizon to a marked extent." পৃ. 83-84.

গণবিজ্ঞান সম্মেলন : কল্যানী

গণবিজ্ঞান সম্মেলন : এক নজরে

'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ'-এর প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোলো গত 22-শে ও 23-শে জুলাই 1989 কল্যাণীর সেন্ট্রাল পার্কের প্রশাসনিক ভবনে। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে আগেই বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, সংগঠন ও ব্যক্তির কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছিল, সমন্বয় কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন খসড়া—সাংগঠনিক নিয়মনীতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কর্ম-সূচীর খসড়া। আবেদন রাখা হয়েছিল, 10ই জুলাইয়ের মধ্যে যেন বিভিন্ন সংগঠন নিজ নিজ মতামত ও সংশোধনী প্রস্তুতি কমিটির কাছে পেশ করে। কিছু সংগঠন তা করলেও, অনেকেই করে উঠতে পারেননি।

প্রথম দিন সভা শুরু হতে একটু দেরিই হয়ে যায়। প্রায় দেড়টা নাগাদ সভা শুরু করা যায়। প্রথমে প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক স্বপন শীল গণবিজ্ঞান সমন্বয় প্রয়াসের সংক্ষিপ্ত পটভূমি বিবৃতি করেন যার কপি আগেই অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয়েছিল।...সভাপতিমণ্ডলী প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সীমিত রাখতে বলেন। সংগঠনপিছু একজন বক্তা এবং দশ মিনিট সময়ও তাঁরা বেঁধে দেন। এতে কিছু কিছু আপত্তি উঠলে সভাপতিমণ্ডলী বক্তাদের নিজেদের মতো করে বলতে দিতে স্বীকৃত হন।

মাঝে মাঝে একটু উত্তাপ, উত্তেজনা হলেও আলোচনা প্রাণবন্তভাবে এগিয়ে চলে। বেশির ভাগ বক্তাই 'লক্ষ্য-উদ্দেশ্য'-এর খসড়ার মধ্যে সীমিত থাকতে পারেন নি। বহু প্রশ্ন ওঠে, বিতর্ক হয়। খসড়ার বয়ানের ভাষা ও কথার তাৎপর্য নিয়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণও করা হয়। সংশোধনী প্রস্তাব হয় বহু রকমের—খোলনলচে বদল থেকে, ধারাগুলির পুনর্বিন্যাস, ধারার ও শব্দের গ্রহণ/বর্জন ইত্যাদি। কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে থেকেই "সমন্বয় কেন্দ্রে"র আনুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তোলার দাবি করেন। একটি সংগঠন, তাড়াহুড়ো না করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বোঝাপড়া বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন সংগঠনের তৈরি জিনিসপত্রের হিসাব-হদিস সংগ্রহ করার কাজের জন্য ছ'মাসের আশু একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়ার জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা নিতে আবেদন রাখে। কয়েকজন বক্তা এই প্রস্তাব ভেবে দেখতে বলেন।

23-শে জুলাইয়ের সভার শুরুতেই প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক স্বপন শীল আগের দিনের আলোচনার ভিত্তিতে "সংশোধিত ও গৃহীত" লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পড়ে শোনান। কর্মসূচী এবং সাংগঠনিক নিয়মনীতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়। আগের রাতে অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন সংস্থার কয়েকজন কর্মী এই দুরূহ কাজটি করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন সভাপতিমণ্ডলী নির্দিষ্ট করেন সাংগঠনিক নিয়মনীতির ওপর আলোচনার জন্যে। কিন্তু এদিনও বক্তারা বারবার সেই আধার থেকে উপচে পড়েন।

বিকেলের অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলী ঘোষণা করেন, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি পরিচালন সমিতি গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি থাকতে পারবেন। আর, পরিচালন সমিতি গঠন করবে এই সভা—এগারো জনকে নিয়ে। সভা থেকে নাম চাওয়া হয়।

অবশেষে সাধারণ পরিষদ ঘোষিত হয়। উপস্থিত 35টি সংগঠনের মধ্যে (আগের দিনের রেজিস্ট্রেশন নথি অনুযায়ী) 20টি সংগঠন থেকে একজন করে প্রতিনিধির নাম দেওয়া হয় সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্তির জন্য। তিনটি সংগঠন পরে প্রতিনিধির নাম স্থির করে পাঠাবে জানায়। একটি সংগঠন—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা—জানায় সংশোধিত খসড়া-গুলির গৃহীত রূপরেখাগুলি লিখিত আকারে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত, এবং সেগুলো নিজ সংগঠনে আলোচনা না করে, তাদের পক্ষে সাধারণ পরিষদ বা পরিচালন সমিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পাঠানো সম্ভব নয়। তবে যৌথ কাজে তারা আগের মতোই অংশ নেবে।

গণবিজ্ঞান সম্মেলন : কাছ থেকে

এগারোজনের পরিচালন সমিতির নামও সভায় ঘোষিত হয়। সৃজন সেন সভাপতি, স্বপন শীল সচিব ও প্রদীপ বসু কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন।

22-শে জুলাই প্রথমেই গণদর্পণের পক্ষে চন্দন রায় বলতে ওঠেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চান। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে বলা হয়—একটা নিয়ম মানা দরকার ; এখন শুধু খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা হবে, অন্য প্রসঙ্গ তোলা চলবে না। এতে সভায় একটু গুঞ্জন ওঠে। কয়েকজন অনুরোধ করেন, বক্তারা যে যাঁর মতো করেই নিজ নিজ বক্তব্য রাখুন, নিয়মকানুনের এত কড়াকড়ি না করলেই ভালো হয়। সভাপতি-মণ্ডলী আর আপত্তি করেননি। চন্দন রায় প্রশ্ন রাখেন—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া সাইন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন (EISCA) এবং সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল নামের তিনটি কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে। তা সত্ত্বেও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের প্রয়োজনই বা কেন আর তা আলাদা হবে কোন কোন দিক থেকে, তা আলোচনা হওয়া দরকার।...শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ এতে সায় দেন।

সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সৃজন সেন বলেন, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র অবশ্যই অন্য তিনটি সংঠনের থেকে পৃথক। চর্চার মধ্যে দিয়েই আমাদের একটা পার্থক্যরেখা তৈরি হয়ে গেছে। তবে সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য পরে আলোচনা করা হবে।

চিন্সুরা সাইন্স ক্লাবের প্রদীপ বসু, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বিলি করা হয়েছিল, তার অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বপন শীল জবাবে বলেন, এটি গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র তৈরির

প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট—গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস নয়। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার সামর্থ্য বা অধিকার আমাদের একার নেই। সবাই মিলে একাজে হাত দিতে হবে।

বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়ের সুব্রত মুখোপাধ্যায়, এতদিন কেন গণবিজ্ঞান আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি বা সমন্বয় কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়নি, তা পর্যালোচনার দাবি জানান।

সভাপতিমণ্ডলী আবার সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আলোচনা 'লক্ষ্য' মুখী করতে হবে অর্থাৎ খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা হোক এখন। সংগঠন পিছু একজন বক্তব্য রাখুন, দশ মিনিটের মধ্যে। কয়েকজন শ্রোতা আবারও এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, বক্তাদের স্বাধীনভাবে বলতে দেওয়া হোক।

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের পক্ষে সুজিত কুমার দাশ খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের শ্লোগানধর্মিতা এবং তজ্জনিত অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝার অবকাশের বহু উদাহরণ তুলে ধরেন।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে রবীন মজুমদার বলতে ওঠেন। তিনি বলেন, দশ তারিখের মধ্যে আমরা আমাদের মতামত পৌছে দিতে পারিনি। এখন আলোচনার জন্য পেশ করছি। তবে আলাদা-আলাদাভাবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং সাংগঠনিক নিয়মনীতি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না। এগুলি পরস্পর সংযুক্ত, তাই এক সঙ্গেই বক্তব্য রাখব এবং আমাদের বক্তব্যের সাইক্লোস্টাইল কপিও আমরা প্রতিটি সংগঠনকে দিয়ে দিচ্ছি।

সভাপতিমণ্ডলী এতে আপত্তি জানান। কোনো "লিফলেট" সভায় বিলি করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়নি, সভাপতিমণ্ডলীকে কপি দেওয়া হয়নি এবং খসড়া লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখতে হবে—এই তাঁদের বক্তব্য। সভায় একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে একটু পরেই তা থেমে যায়। রবীন মজুমদার নিজের মতো করেই বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের কপিও দেওয়া হয়—সভাপতিমণ্ডলীকে এবং উপস্থিত সংগঠনগুলিকে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার মোদ্দা বক্তব্য ছিল—কেন্দ্রীয় কোনো সংগঠনের তরফে নিয়মকানুনের বেড়াজাল তৈরির প্রচেষ্টা স্থগিত থাকতে পারে। পরিবর্তে সমন্বয়ের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আগামী ছ'মাসের জন্য একটি ছোট কর্মসূচী হাতে নেওয়া হোক। বক্তব্যে সেই কর্মসূচীর রূপরেখা ও তার সম্ভাব্য খরচের হিসেবও তুলে ধরা হয় এবং বর্তমান সভাকে সেটুকু ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়। বলা হয়, এর ফলেই সাংগঠনিক কাঠামোটা কাজের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ নেবে। প্রস্তাবিত খসড়াগুলিতে বিভিন্ন অসংগতি, ভ্রান্তি এবং কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে বলে ব্যাখ্যা রাখা হয়।

'উৎস মানুষ' পত্রিকার তরফে বলতে ওঠেন স্মরজিৎ জানা। তাঁর বক্তব্য—আমরা একই সাথে উৎফুল্ল এবং হতাশ। উৎফুল্ল, কারণ সমন্বয়ের চেষ্টা ও উৎসাহ বাড়ছে। হতাশ, কারণ অতীতের ভুলভ্রান্তি ও ব্যর্থতার পর্যালোচনা মূল্যায়ন ছাড়াই একটা সংগঠন গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। আবার যেন সেই শুরুর জায়গাতেই শুরু হচ্ছে। খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিশাল ফর্দ, পৃথিবীর যাবতীয় কিছু যেন এতে ঢোকানো হয়েছে। "দেশীয় ঐতিহ্যগত" বা "জাতীয় বিজ্ঞান" কী? দেশে দেশে বিজ্ঞান কি তাহলে আলাদা? গণবিজ্ঞান কী? "সামন্তবাদী পশ্চাদপদ মূল্যবোধ" বলতে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? "দেশপ্রেমিক" বিজ্ঞানী কারা? এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, 90 শতাংশ মানুষ মনে করেন, "দেশপ্রেমিক" বিজ্ঞানীরাই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবনের গবেষণা করেন। "ধর্মীয় আবেগ"কে কিভাবে "মর্যাদা" দেওয়া যাবে? রামজন্মভূমির ব্যাপার বা খোমেইনির ডাক, এসবই তো ধর্মীয় আবেগের ব্যাপার!

বেলঘরিয়া গণবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তরফ থেকে দেবাশিস দেবনাথ অভিযোগ করেন, খসড়াগুলি তাঁরা সময়মতো পাননি। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের খসড়া বয়ানে ভাষাগত ত্রুটি ও অস্পষ্টতার কথা তিনি উল্লেখ করেন এবং সমালোচনা করে বলেন, পরমাণুশক্তির বিরোধিতার লক্ষ্যের উল্লেখ নেই।

সোদপুর বিজ্ঞান চেতনার দেবজিৎ চক্রবর্তী বলেন, সমন্বয় কেন্দ্র তৈরির আশা নিয়ে বার বার আসি, ফিরে যাই ব্যর্থতা আর হতাশা নিয়ে। সমন্বয় কেন্দ্রের চরিত্র কি হবে তা নিয়ে মীমাংসা আজই হবে না ঠিক। কিন্তু এই মুহূর্তেই সমন্বয়ের প্রয়োজন।...খসড়াগুলির ভাষা সহজ করা দরকারি। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রস্তাবমতো আগামী ছ'মাসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে সমন্বয় প্রয়াসের চেষ্টা করার কথা ভেবে দেখা উচিত।

রিষড়া গণবিজ্ঞান পরিষদের দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, অনন্তকাল ধরে গণবিজ্ঞানের সংজ্ঞা খোঁজার সমালোচনা করেন। স্মরজিৎ জানার বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক সোশিওলজিস্টের মতেই, দেশে দেশে বিজ্ঞান আলাদা। আশু কাজকর্মের ভিত্তিতেই একজায়গায় আসা দরকার।

সাইন্স অ্যাণ্ড কালচারাল সেন্টার (পাইকপাড়া)-এর অঞ্জন মিত্র বলেন, বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠনের কী কী রিসোর্স আছে আমরা জানি না। পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান, একসাথে প্রোগ্রাম করা, এসব দরকার। তাই সমন্বয়ের প্রয়োজন। খসড়াগুলির ভাষায় প্রাঞ্জলতার অভাবের কথাও তিনি বলেন।

শান্তিপুর সাইন্স ক্লাবের তাপস চক্রবর্তীও খসড়া লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কিছু কিছু কথা তুলে ধরে অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝার অবকাশ থাকার কথা বলেন। "দেশীয় ঐতিহ্যগত বিজ্ঞান", তাঁর মতে একটি ভুল কথা। কারণ বিজ্ঞানের কোনো ঐতিহ্য নেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। প্রয়োজনে সংগঠনগুলি "শর্তহীন বিদেশী সাহায্য নিতে পারবে" খসড়ায় বলা হয়েছে। কিন্তু বিদেশী সাহায্য কি সত্যিই শর্তহীন হয়?—তার প্রশ্ন। নিউক্লিয়ার-বিরোধী বহু আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে গণবিজ্ঞানকর্মীদের নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয়, তবে কি নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে "কেন্দ্র" এগিয়ে আসবে?

বালি বিজ্ঞান সংস্থার পূরবী ঘোষ বলেন—আমাদের সংগঠনের সদস্যরা

অধিকাংশই বয়সে ও অভিজ্ঞতায় নবীন। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তাদের অজানা। তাদের পক্ষে আমি জানাতে চাই, খসড়ার ভাষায় তারা নির্দেশের সুর বা আঁচ পেয়েছে। বড়রা যেন ছোটদের নির্দেশ দিচ্ছে এমন একটা সুর খসড়ার ভাষায় আছে বলে তাদের মনে হয়েছে। যদি "গণ" শব্দটা রাখা হয় তবে ছোট বড় কেন? বলা হচ্ছে "তরুণরা বিনয়ী হোক।"…ছোটরা বিনয় দেখাবে আর বড়রা বন্ধুত্বের ভাব দেখাবে…। একটা কম্যাণ্ডিং টোন, একটা ডিকটেটিং টোন খসড়ায় ফুটে উঠেছে।

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে জয়দেব দে, "সামন্তবাদী পশ্চাদ-পদ মূল্যবোধ", "বিকল্প প্রযুক্তি" এসব চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, এই সভা থেকেই রাজ্য কমিটি তেরি হোক।

ভাটপাড়া বিজ্ঞান সংস্থার দেবাশিস পাল বলেন—"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মী" ও "উৎস মানুষ" পত্রিকার ওপর আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই সভায় তাদের আচরণে আমরা হতাশ। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মী" (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) কেন প্রচারপত্র বিলি করলেন? তাঁরা কি চান না বিান আন্দোলন প্রসারিত হোক? মফস্বলের সংগঠনগুলোর অসুবিধে তাঁরা বুঝতে চাইছেন না।…কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠা খুবই দরকার।

নৈহাটি ইনস্টিটিউট অভ সাইন্স অ্যাণ্ড কালচারের দেবজ্যোতি গুপ্ত দলিলের বক্তব্য নিয়ে নতুন করে বিতর্ক অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি বলেন, এরকম একটি বিতর্ক চলতে থাকলে কোনোদিনই স্থায়ী দলিল তৈরি হবে না। তবে তিনি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ধারাগুলির পুনর্বিন্যাস ও নানা সংশোধনের কথাও বলেন।

চন্দননগরের প্রতিনিধিও (আমাদের অসতর্কতায় তাঁর এবং তাঁর সংগঠনের নামটা আমরা খেয়াল করতে পারিনি) স্থায়ী কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার ওপর জোর দেন এবং আশা করেন কেন্দ্রীয় সংগঠন যেন আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে অংশ নেয়।

মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন—প্রতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের পুরোপুরি বিরোধিতা না করে গণবিজ্ঞান আন্দোলন, তার প্রগতিশীল অংশকে সঙ্গে নেবার কথা ভাবতে পারে। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটা প্রচ্ছন্ন প্রগতিশীল রাজনীতি থাকা দরকার। কিন্তু দেখতে হবে, আমরা যেন কোনো রাজনৈতিক দলের ছাপমারা না হই।

বাঁশবেড়িয়া সানডে মিটিং-এর সত্যনারায়ণ পাল তাঁদের অঞ্চলের কর্মকাণ্ডের কিছু প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন—সম্প্রতি 'ছাইপীড়িত নাগরিক কমিটির' ডাকে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ছড়ানো ছাই-এর বিরুদ্ধে। নাগরিক কমিটি দলীয় রাজনীতি বাইরে রেখে ছাইপীড়িতদের সমবেত হবার ডাক দেন। শ্রী পালের মতে, এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয়ে গণবিজ্ঞান আন্দোলন কতখানি সহায়ক হতে পারে। সমন্বয় তাই হওয়া প্রয়োজন।

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের সুজিত কুমার দাশ বলেন—কাজ না করলে সংগঠনের দরকার হয় না। তবে যৌথভাবে কাজ করতে হলে সংগঠন দরকার। মনে রাখতে হবে, আকৃতিহীন সংগঠনও সংগঠন। 6 মাসের পরীক্ষামূলক সংগঠন করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সংগঠনে থাকাটা দরকারি। গণতন্ত্র একটা প্র্যাকটিস। আবার অগণতান্ত্রিক কাঠামোর সংগঠনও গণতান্ত্রিক হবে যদি সদস্যরা গণতন্ত্র প্র্যাকটিস করে। কাজেই কাজ করার ক্ষেত্রে কাঠামোটা কোনো সমস্যা নয়। সংগঠন আকারে যত বড় হবে সংগঠনে আমলাতন্ত্রও তত বাড়বে—সংগঠনে শৃঙ্খলা বাড়বে—ব্যক্তিসদস্যের কাজের দায়িত্বও বাড়বে। সরকারি আমলাতন্ত্র খারাপ কিন্তু এখানে সদর্থেই আমলাতন্ত্রের কথা বলছি। তিনি আরো বলেন, এমন কিছু কিছু সমস্যা আছে, যার সমাধান বা সিদ্ধান্ত জাতীয় স্তরেই হওয়া উচিত। পরিচালকমণ্ডলীতে ব্যক্তিসদস্য থাকাও তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

লোকবিজ্ঞান সংগঠনের শ্যামল রায় বলেন—গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কেন্দ্রীয় একটি মঞ্চ গঠনের চেষ্টা বার বার ব্যাহত হয়েছে। কেন্দ্রীয় একটি সংগঠনের অভাবই এর মূল কারণ। কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টার ফলেই মত-বিরোধ দূর হবে, প্রত্যেক সংগঠন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। …সংশোধিত খসড়া যা পেশ করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত। তবে খসড়ার ভাষা হয়ত সকলের বোধগম্য হয়নি—গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এগিয়ে থাকা কর্মীরাই এগুলি বুঝতে পারবেন। সাধারণ কর্মীদের বোধগম্য করেও বিষয়গুলি রাখা দরকার। "লোকবিজ্ঞান" পত্রিকায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে আমরা সাধারণবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য লিখেছি।…আমরা ভারতের মানুষকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে চাইছি যাতে সবাই সবচেয়ে ভালোভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণের উপযোগী হয়ে ওঠে। আর, একাজ প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানচর্চার বিরোধিতা না করে করা যাবে না।

অ্যান্টিনিউক্লিয়ার ফোরামের প্রদীপ দত্ত শ্যামলবাবুর বক্তব্যের জের টেনে শ্লেষের সঙ্গে বলেন, এতক্ষণে বুঝলাম, কেন আমি খসড়া বুঝতে পারিনি, আমি পশ্চাৎপদ বিজ্ঞানকর্মী! খসড়ায় পরমাণুশক্তি বিরোধিতার নামগন্ধও নেই। এটা স্বেচ্ছায় হলে লজ্জাজনক আর অনিচ্ছায় হলে দুর্ভাগ্যজনক। আগে কেন্দ্রীয় সংগঠন তৈরি হোক, পরে কাজ—এই মনোভাব ঠিক নয়।

চিন্সুরা সাইন্স ক্লাবের প্রদীপ বসু বলেন—এই সভা থেকেই আঞ্চলিক কমিটি ও পরিচালকমণ্ডলী তৈরী হোক।

এদিনের শেষ বক্তা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সৌমেন গুহ বলেন—সভায় প্রচারপত্র বিলি করা কোনো অপরাধ নয়।…গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র কথাটিই সঙ্গতিহীন, গোলমেলে, অবাস্তব। হয় "সমন্বয়", নয় "কেন্দ্র" —দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। সমন্বয় 'কমিটি' বড়জোর হতে পারে।

চার্বাক সাংস্কৃতিক সংস্থার গান দিয়ে 22শে জুলাইয়ের সভা শেষ হয়।

23শে জুলাইয়ের সভায় তেমন নতুন বক্তব্য আসেনি। আমরা

নোটও রাখিনি। বেশির ভাগ বক্তাই তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ থেকে আগের দিন রাখা বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন।

সংযোজন : পশ্চিমবঙ্গে গণবিজ্ঞান ভাবনা ও কাজকর্ম একটা আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠন তাঁদের উদ্যোগ ও উদ্যম এর সাথে যুক্ত করেছেন, করছেন ও করতে চাইছেন। কিন্তু এই সব স্বশাসিত স্বেচ্ছা-উদ্যোগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এই সম্মেলন থেকে একটি 'সমন্বয় কেন্দ্রে'র আনুষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা গুরুত্ব সহকারে সম্মেলনের পটভূমি পর্যালোচনার প্রয়াস পায় এবং আমাদের মনে হয় তড়িঘড়ি একটি সংগঠন তৈরী করে স্বাধীনভাবে কর্মরত গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়াটা মারাত্মক ভুল হবে। কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনায় সমন্বয় আনার চেষ্টা জোরদার করাই হবে আশু কর্তব্য। তাই আমরা ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে সমন্বয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য স্বল্পমেয়াদী ছোট্ট একটি পরিকল্পনা পেশ করি। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এবং সম্মেলনে উপস্থিত কিছু কর্মীবন্ধু আমাদের ভুল বুঝেছেন।

প্রস্তাবিত 'কেন্দ্র' গড়ার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই এমন একটি কড়াকড়ি নিয়মতান্ত্রিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যে খোলামেলা আলোচনা-আদান প্রদান তাতে ব্যাহতই হয়। যেমন, প্রস্তুতি কমিটি প্রতিটি সংগঠন থেকে অনধিক পাঁচজনের অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন ; তার মধ্যে একজন হবেন 'প্রতিনিধি' এবং বাকী চারজন 'পরিদর্শক'। কার্যত কিন্তু দেখা যায় বেশ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষে পাঁচের অধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত। বাড়তিদের ব্যাজ জোটে 'সেচ্ছাসেবক'। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আটজন অংশগ্রহণকারী এইরকম বিভিন্ন 'খেতাব' গ্রহণে আপত্তি জানায় এবং ব্যাজ ছাড়াই সভায় যোগ দেয়।

কল্যাণীরই 'প্রগতি-বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক, অমূল্য মণ্ডল, দীর্ঘদিন যাবৎ গণবিজ্ঞানের কাজে নিরলস উদ্যোগ ও প্রচার চালিয়ে আসছেন। সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উদ্যোক্তারা তাঁর সাহায্য পরামর্শও নেন, কিন্তু 'প্রগতি বার্তা'কে আমন্ত্রণ করতে কিংবা খসড়া দলিলগুলি পাঠাতে 'ভুলে' যান ! প্রথম দিনের সভায় 'প্রগতিবার্তার' সম্পাদক কিন্তু যথারীতি হাজির হন এবং নিয়মমাফিক চাঁদা দিয়েই নাম রেজিষ্ট্রি করান।

সভা-পরিচালনার কাজে নিযুক্ত সভাপতিমণ্ডলী বক্তাদের জন্য কিছু নিয়ম বেঁধে দিতে চাইলে এবং শুধুমাত্র 'প্রতিনিধি'-কেই বলতে হবে বলায়, শ্রীমণ্ডল তাঁর অবস্থার কথা জানান। প্রস্তুত কমিটির পক্ষে ভুল স্বীকার করা হয়।

প্রথম দিনের সভা শুরু হতে অনেক দেরী হয়। কিন্তু সভায় অংশগ্রহণকারীরা সবিস্ময়ে দেখলেন 'সভাপতিমণ্ডলী' আগেই ঠিক হয়ে গেছে। হয়তো উদ্যোক্তারা দেরীটা পুষিয়ে নেবার জন্যই এটা করেছিলেন !

গোটা সম্মেলন, লক্ষ্য করা যায়,—চারটি মাত্র সংগঠনের পক্ষে সমন্বয় কেন্দ্র তথা 'কেন্দ্রীয়' কমিটি তৈরীর জন্য জোরালো দাবী পেশ করা হয় এবং সভাপতিমণ্ডলীতে ঐ সংগঠনেরই প্রতিনিধিরা ছিলেন।

তবুও, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় আলোচনা শেষ পর্যন্ত অনেকটা খোলামেলা ও প্রাণবন্তই হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা যে বিকল্প সমন্বয়ী কর্মসূচীর (আনুষ্ঠানিক সংগঠন বা কেন্দ্র নয়) প্রস্তাব রাখে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা সমর্থন করেন বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধি ও বক্তা। বাঁশবেড়িয়ার সানডে সিটিং-এর সত্যনারায়ণ পাল ও মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের বক্তব্যেও বোঝা যায় যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সামনে রেখে, রাজনৈতিক ধাঁচের একটি 'কেন্দ্র' তৈরী করে ও কেন্দ্রীয় নিয়মনির্দেশ জারী করে গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও ও সমন্বয় জোরদার করা বর্তমানে সম্ভব নয়। স্মরজিৎ জানা, ('উৎস-মানুষ'), সুজিত কুমার দাস ও ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (নো মোর ভূপাল কমিটি), পূরবী ঘোষ (বালী বিজ্ঞান সংস্থা) ও আরও অনেকের বক্তব্যে সে সুর ফুটে ওঠে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের পক্ষে খসড়া দলিলগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করেই আলোচনা-সমালোচনার পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

বস্তুত, সম্মেলনে যে মূল দ্বন্দ্ব দাঁড়িয়েছিল তা হ'ল—গণবিজ্ঞানের কাজে সমন্বয় আনা যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় সংগঠনের অভাবে নাকি ন্যূনতম সমন্বয়ের অভাবেই উপযুক্ত সংগঠন গড়ে উঠছে না। দুটো মতের পক্ষেই জোরালো যুক্তি হাজির করা হয়। কিন্তু অনেকে ভুল বুঝেছেন—মনে করেছেন যে কোন কোন সংগঠন বুঝি সমন্বয়ের বিরোধিতা করতে চাইছেন।

যাই হোক, সভা মোটামুটিভাবে প্রথম মতটির—অর্থাৎ সংগঠনের অভাবই সমন্বয় আনতে পারছে না—পক্ষেই রায় দিয়েছে। গড়ে উঠেছে 'সমন্বয় কেন্দ্রে'র সাধারণ পরিষদ ও পরিচালন সমিতি। এই তাড়াহুড়োর ফলে গৃহীত সাংগঠনিক নিয়মনীতিতে বেশ কিছু মারাত্মক ত্রুটি রয়েই গেল। যেমন, তিনটি সংগঠনের সম্মিলিত প্রস্তাবের ফলে কোন ব্যক্তিসদস্য গৃহীত হবে—এই নিয়মের ফাঁক ধরে একই তিনটি সংগঠন বহু ব্যক্তিকে সদস্য করার সুপারিশ করতেই পারেন। অবশ্য আমরা মনে করি যে কোন আগ্রহী ব্যক্তির সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার অবাধ অধিকার থাকা উচিত। বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির নিজ নিজ যোগাযোগ ও যৌথ প্রচেষ্টা গড়ে তোলায় কেন্দ্রীয় অনুমোদন প্রয়োজন হলে কি আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারবে ? এই সব বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে দু'দিনে অন্তত পাঁচজন বক্তা এসবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। হয়তো উপস্থিত অন্য বন্ধুরা আন্তরিকভাবেই মনে করেন যে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনই গণবিজ্ঞান ভাবনা-চিন্তার সমন্বয় ও প্রসার আনতে পারবে ; যাবতীয় বিরোধ ও অস্পষ্টতার অবসান ঘটিয়ে আন্দোলনে জোয়ার আনতে পারবে। সঠিক জানি না আমরা, হতেও পারে। তবে 1982'র পর এই প্রথম গণবিজ্ঞান কর্মীরা নিজ পরিচয়বহন করে হিরোসিমা দিবস পালন করতে পারলেন না—"সমন্বয়" গড়ে ওঠার পরও। আমরা শুধু ঘটনা হিসেবেই আপাতত এটি উল্লেখ করছি।

প্রতিবেদক : পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পক্ষে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা ॥

মন্দিরবাজার : আন্দোলন ও তারপর

বি-ও-বি'র নিয়মিত পাঠক মাত্রেই জানেন যে, লক্ষীকান্তপুরের কাছে ছোট রামকৃষ্ণপুর মৌজায় বেসরকারী উদ্যোগে "সুন্দরবন সার কারখানা" স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়েছিল 1986 সালের শেষদিকে। সেই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু পরিমাণ ধানী জমি কেনেন। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে শুরু হয় ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় সার কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ক্রমে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের ব্যাপক মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হন। এলাকায় গড়ে ওঠে তীব্র গণ-আন্দোলন। জমির মালিকরা শত প্রলোভনেও জমি বিক্রি করতে চাইলেন না। তারপরের ইতিহাস—কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অশুভ আঁতাত—কর্তৃপক্ষের কল্যাণে প্রশাসনিক তৎপরতা—আন্দোলনকারীদের নানাভাবে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন—সংশ্লিষ্ট জমি মালিকদের প্রতি হুমকি ইত্যাদি।

এত ক'রেও ভবি কিন্তু ভোলেনি। বেগতিক দেখে একে একে সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। স্থানীয় কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত এজেন্ট হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। নিরাশ কারখানা কর্তৃপক্ষ সব দেখেশুনে রণে ভঙ্গ দিলেন। লক্ষীকান্তপুর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল প্রস্তাবিত কারখানার স্থানীয় অফিস। সরিয়ে নেওরা হল বড় সাইন বোর্ড।

ইতিমধ্যে একটা দৈনিকে একদিন খবর বেরুলো—"সুন্দরবন সার কারখানা ত্রিপুরায় চলে যাচ্ছে।" খবরটির সূত্র জানানো হয় নি। এলাকার লড়াকু মানুষ খবরটিকে বিশেষ আমল দেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল এটা নিছক একটা চাল। এই ধারণা অবশ্য পরে সত্যি ব'লে প্রমাণিত হয়। কেননা কিছুদিন পর স্থানীয় একজন এজেন্ট প্রচার করলেন—সার কারখানা কুলপীর দক্ষিণ পশ্চিমে ট্যাংরার চরে চলে যাবে। আবার কয়েতদিন পরে তাঁরই মুখ থেকে শোনা গেল এই সার কারখানা হবে কোচবিহারে···এক মাসের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য এসব প্রচারের পর এক বছর কেটে গেল কিন্তু, সার কারখানা কোথাও চলে গেল না। অন্যদিকে কারখানার স্থানীয় অফিসের আসবাবপত্র, সাইনবোর্ড প্রভৃতি একজন এজেন্টের বাড়ীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। উক্ত এজেন্ট এখনো মাসে মাসে বেতন পাচ্ছেন বলে জানা গেল। প্রতি সপ্তাহে তিনি কোলকাতার হেড অফিসে এবং সোনারপুরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। কেনা জমিগুলো তিন বছর অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে। সেখানে প্রতি বর্ষায় বড় বড় ঘাস জন্মায়। পার্শ্ববর্তী রামেশ্বরপুর গ্রামের কয়েকজন জানালেন ঐ ঘাস জন্মানোর ফলে অনেক গরীব মানুষের উপকার হচ্ছে। কারণ বর্ষাকালে খড়ের দাম যখন চড়া তখন ঘরের কাছে বিনা পয়সায় যথেষ্ট গোখাদ্য পাচ্ছেন তাঁরা!

সার কারখানা না হওয়ায় এলাকার আবালবৃদ্ধবণিতা প্রতিরোধ কমিটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁদের ধারণা, ঠিক সময়ে আন্দোলন না করলে সার কারখানা গড়ে উঠতো এবং একবার গড়ে উঠলে কোনভাবে তাকে তোলা যেত না। তখন আর দুঃখের অন্ত থাকতো না।

প্রসঙ্গত একটা মজার বিষয় উল্লেখ না করে পাঁরছি না। উক্ত কারখানার কর্তাব্যক্তিরা কোলকাতা থেকে লক্ষীকান্তপুরে আসা যাওয়া করতেন একটা বিশেষ রঙের মারুতি গাড়ীতে ক'রে (মাঝে মধ্যে অ্যাম্বাসাডরও ব্যবহার করতেন)। তাই এখন যদি এলাকায় সেই বিশেষ রঙের মারুতি গাড়ী প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সেই গাড়ীর ওপর নজর রাখা হয়। গাড়ীটি কোন্ দিকে গেল—কোথায় কোথায় থামলো, ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। আর প্রয়োজন হলে খবরটা বিদ্যুৎগতিতে সারা এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে এলাকার রিক্সা-ভ্যানচালকরাও প্ররিরোধ কমিটির বিশ্বস্ত সহযোগীর ভূমিকা নেন। অবশ্য গত কয়েক মাসের মধ্যে কারখানার কোন কর্তাব্যক্তিকে এলাকায় দেখা যায় নি।

অপরপক্ষে প্রতিরোধ কমিটি কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে নেই। পরিবেশ আন্দোলনে নানা কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে কমিটির উদ্যোগে। কমিটি এখন সামাজিক দূরণের বিরুদ্ধেও লড়াই শুরু করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে নিয়মিত সভা-সমিতি-বৈঠক করে মানুষকে সচেতন করছেন। অল্পদিনে বিষয়টি এলাকার যুবমনে বেশ সাড়া জাগিয়েছে বলে মনে হল। তাছাড়া প্রতিরোধ কমিটি সুন্দরবনের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পুরোদমে গণস্বাক্ষর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।

কমিটি সূত্রে প্রকাশ, এলাকার বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের এক উঁচু দরের নেতা এখনো দলীয় বৈঠকে ও প্রকাশ্য সভায় মাঝে মধ্যে বলে বেড়াচ্ছেন—"লক্ষীকান্তপুর এলাকার উন্নয়নের জন্যে একটা সার কারখানা করতে চাইলাম কিন্তু অমুক দল করতে দিল না।" যদিও তাঁর নিজের দলের অনেকেই তাঁর এই কথায় কোন গুরুত্ব দেন না। কারণ এখানে কোন বিশেষ দল কারখানা গড়তে বাধা দেননি, বাধা দিয়েছেন এলাকার সব দলের মিলিত সংগঠন—মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি।

দু'মাস আগে কারখানা কর্তৃপক্ষ কেনা জমিগুলো হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সেই লিখিত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে—"উপযুক্ত মূল্যে কেনা জমিগুলো হস্তান্তর করা হবে।" তবে এই উপযুক্ত মূল্য কত তা' স্পষ্ট নয়। স্বভাবতই জমিগুলো কেনার বিষয়ে এলাকার মানুষের আদৌ আগ্রহ নেই বলে জানা গেল।

এই অবস্থায় এলাকার সাধারণ মানুষ ধরেই নিয়েছেন—লক্ষীকান্তপুর এলাকায় আর সার কারখানা হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা একথা মানতে রাজী নন। ফলে তাঁরা সবকিছুর ওপর সতর্ক নজর রাখছেন। কমিটির সম্পাদক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "কোম্পানীর কেনা জমিগুলো যেদিন হস্তান্তর হয়ে যাবে সেদিন বুঝবো এখান থেকে সত্যি ওঁরা পাততাড়ি গোটালেন—তার আগে নয়।"

দিলীপ বৈদ্য

তেজস্ক্রিয় ছড়া

তেজস্ক্রিয় গুরু,
মাদারি খেল শুরু।
তেজস্ক্রিয় রশ্মি,
এক্কেবারে নস্যি।
তেজস্ক্রিয় ছাই,
পেলেই আমি খাই।
তেজস্ক্রিয় ভয়,
এমন কিছু নয়।
তেজস্ক্রিয় পদ্য,
লিখছি আমি সদ্য।

তেজস্ক্রিয় গুরু

তেজস্ক্রিয় ঘাম

রাজা বলেন—'চুল্লি হবে,'
শুনে সবাই ঘামছে,
রাজা বলেন—'উন্নতিকে
ধরবো আমি থামচে।'

তেজস্ক্রিয় চিন্তা

ওদের বাতিল চুল্লি নিয়ে
আমরা হলাম ধন্য হে,
এখন শুধুই চিন্তা মনে
চেরনোবিলের জন্য হে।

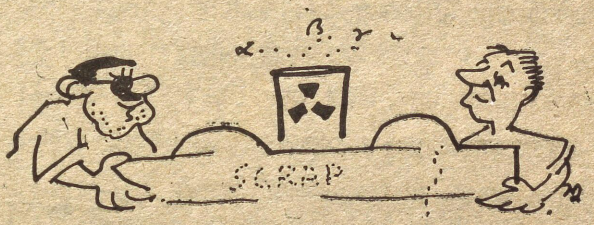

তেজস্ক্রিয় ছাই

ফেলতে হবে তেজস্ক্রিয় ছাই,
বলতো গবু জায়গা কোথা পাই?
বললো গবু—ওরা বড়ই নিঃস্ব,
ছাই ফেলতে আছে তৃতীয় বিশ্ব।

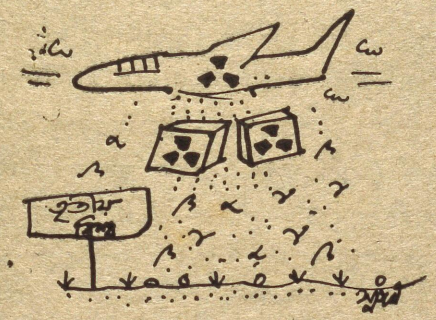

তেজস্ক্রিয় ভয়

চেরনোবিলের দুর্ঘটনা
ভয় পেয়েছো তাই?
এইখানেতে হবেনা তা
Technology High.

নিশীথ চৌধুরী

বিকল্প নোবেল পুরস্কার : 'আনন্দাবেগ-আতিশয্য'

বিকল্প নোবেল পুরস্কার সম্পর্কিত 'বি-ও-বি'র দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যার পৃষ্ঠা 22-এ প্রকাশিত সৌমেন গুহ মশাই-এর প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণতাজনিত কারণে একটু বিভ্রান্তিকর। লেখাটির প্রথম ত্রুটি হ'ল আংশিক তথ্য পরিবেশন; দ্বিতীয় ত্রুটি হ'ল উপস্থাপনাদোষে 'অংশ'কে 'সমগ্র' ব'লে বিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা; এবং তৃতীয়টি হ'ল ব্যক্তিগত পরিচিতির সুবাদে আনন্দাবেগ-আতিশয্য। মনে হয়, সবগুলো ত্রুটিরই উৎস, আসলে, ঐ শেষটিই। কারণ, সৌমেন বাবু তাৎক্ষণিকতাস্পৃষ্ট "মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোড়ন"-এর কথা দিয়েই তাঁর লেখা শুরু করেছেন। তা হোক। ভুল-বোঝাবুঝি বন্ধ করতে আগেই দুটি কথা বলে নেওয়া ভালো। প্রথমত, পূর্ণ তথ্যাভাবের ব্যাপারটি না ঘটলে এ প্রসঙ্গে কোনো চিঠি লেখা আমি খুব সতর্কভাবেই এড়িয়ে যেতাম। দ্বিতীয়ত, মহান (না মহতী?) সেবাব্রতী ডাঃ ইঙ্গে কেম্প গেনেফকে আমিও, দূর থেকেই, সৌমেন বাবুর সমানই শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি, তাঁর স্থাপিত দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে ক্ষীণতম অনুচিকীর্ষা জাগালেই শ্রীমতী গেনেফ-এর পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটি খুব সঠিকভাবে এবং প্রকৃত অর্থে সার্থক ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু, অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে বিশ্বাস ও তার রূপায়ণের পথে বাধা যেমন দুস্তর, আমাদের বিফলতা ও অসাফল্যও, আজ পর্যন্ত, তেমনই বিস্তর।

সৌমেনবাবু পরিবেশিত সংবাদের শিরোনাম থেকে মনে হ'তে পারে, এবং আমার মনে হ'য়েছে যে, বিকল্প নোবেল পুরস্কারটি 1988 সালে **এককভাবে** পেয়েছেন ডাঃ ইঙ্গে কেম্প গেনেফ—কিন্তু তা ঘটনা নয়। তিনি বিকল্প নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন **আংশিকভাবে এবং সাম্মানিকভিত্তিতে**। সহ প্রাপকরা হলেন মালয়েশিয়ার 'ফ্রেণ্ডস্ অব দ্য আর্থ' (সহবত আলম)—বৃষ্টিবন সংরক্ষণে যাঁরা পরিবেশবিদ্যাবিশারদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান রেখেছেন; তাছাড়া আছেন ব্রেজিলের কৃষি ও পরিবেশবিদ্যাবিশেষজ্ঞ জোন লুৎজেনবার্গার এবং ব্রিটেনের জন এফ. সি. টার্নার—যিনি গৃহনির্মাণ প্রকল্পসমূহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, আর ডাঃ ইঙ্গে কেম্প গেনেফ পেয়েছেন নির্যাতিতদের জন্য তাঁর মহান সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিতে 'সাম্মানিক' পুরস্কার [সংবাদসূত্র: **SCIENCE 242**, নং 4882, পৃঃ 1123 (1988)]। মোট এক লক্ষ ডলার পুরস্কার এঁদের সবার মধ্যে ভাগাভাগি হবে। তা হবে কেমন ভাবে, অর্থাৎ ভাগাভাগির অনুপাতটি হবে কেমন, সেটা অবশ্য জানা যায়নি। একটি কথা পুনর্বার উল্লেখ্য—পুরস্কার আংশিকই হোক বা পূর্ণই হোক, ডাঃ গেনেফের মহান সেবাদর্শের মর্যাদা তাতে বিন্দুমাত্র খর্ব বা খণ্ডীকৃত হয় না—পুরস্কারটি তো এক্ষেত্রে প্রতীকী মাত্র।

সবশেষে, আরেকটি বলবার কথা থাকে। যে 'নোবেল পুরস্কার' শব্দ ব্যবহার নিয়ে সৌমেনবাবুর ক্ষোভ-রাগ-অনুযোগ-সমালোচনা 'বি-ও-বি'র পাতায় অতীতে আমরা দেখেছি, সেই ব্রাত্য (!) শব্দ দুটিকেই সৌমেন বাবু ব্যবহার করে ফেললেন তাঁর লেখায়, তাও আবার একেবারে শিরোনামেই বেশ মোটা দাগে? এতে কৌতুক অনুভব না ক'রে পারা যায়? আর 'বিকল্প' শব্দের বিশেষণীয় 'শাক' দিয়ে কি ভেতরের দুর্বলতার 'মাছ'টি ঢাকা পড়ে, সৌমেনবাবু?

সুব্রত ভট্টাচার্য

বিকল্প নোবেল : 'ক'টা মানবিক পংক্তি'

সুব্রত ভট্টাচার্যের চিঠিটা পড়লাম, অভিযোগ বা সমালোচনা মূলত দু'টি পয়েন্টে। দ্বিতীয়টির উত্তরে বলি—'কেষ্টর মাথা ফেটেছিলো' এমন কথা বলতে সুস্থ প্রবন্ধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে সে—'ফাটা কেষ্ট'? আমার লেখায় বা কথায় কখনো অসতর্ক হয়েও 'নোবেল' বা 'বিকল্প নোবেলজয়ী ইঙ্গে' কথাটি বেরোবে না। তফাৎটা সুব্রত ধরতে পারবেন তো?

আমার নিবন্ধে যদি কারো মনে হয় 1988 সালে এককভাবে ইঙ্গে বিকল্প নোবেল পুরস্কার পেয়েছে—সুব্রতর চিঠিতে তাদের ভুল ভাঙবে। যদিও এ প্রসঙ্গে দু'টি ব্যাপার বলে রাখি—পুরস্কার প্রাপ্তির সার্বিক কোনো সংবাদ আমার দেয়ার তিলমাত্র ইচ্ছে ছিলো না। ঘনিষ্ঠ একজন পেয়েছে, খবরটা দ্রুত বহুজনকে জানিয়েছি—শুধু 'বি-ও-বি'-তে নিজে লেখার ঝুঁকি নিয়েছি। দ্বিতীয়ত—বিকল্প নোবেল পুরস্কারের সরকারী খবর প্রকাশের অনেক আগে জানতে পারি ইঙ্গের ব্যাপারটা। নিখাদভাবে আমি কোনো পুরস্কারের কোনো ধরনের খবর নিয়ে মাথা ঘামাই না। আবার আমার জানা ব্যক্তি বা সংগঠন কী পাচ্ছে—পুরস্কার না তিরস্কার—চেষ্টা করি খবর রাখার। তফাৎটা সুব্রত ধরতে পারবেন তো?

হ্যাঁ, সুব্রত ও আমি দু'জনেই একটা ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেছি—পুরস্কারটির অর্থের ব্যাপারে। আসলে—**ইঙ্গে বিকল্প নোবেল পুরস্কারের একটি পয়সাও পাবে না**। ইঙ্গে নিজেও প্রথমে জানতো না—যখন আমি খবর পাই ও লিখি।

শেষ কথা কয়েকটা—

ব্যক্তিগত পরিচিতি শব্দটাও সামান্য—ইঙ্গের সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখায় এতো বেশী ঘনিষ্ঠতার ছাপ থাকতে পারে বলেই ভাবতে ভালো লাগে, শুষ্ক লেখা হাত থেকে বেরোয় নি। তবু 'বি-ও-বি'তে ক'টা মানবিক পংক্তি লিখতে পেরেছি। সুব্রত অনুভব করতে পারবেন তো?

সৌমেন গুহ

রণজিৎ : 'স্মৃতির ফুল'

রণজিৎ ফিরে এলো না। রণজিৎ—আমাদের বন্ধু গণবিজ্ঞান কর্মী ডাঃ রণজিৎ ঘোষ। মারাত্মক রক্তের ক্যানসার— অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকিমিয়ায় ভুগছিল রণজিৎ। দেশের প্রাথমিক চিকিৎসার পর অস্থি-মজ্জা সংস্থাপন (bone marrow transplantation)-এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় লণ্ডনের রয়েল মার্সডেন হাসপাতালে। সেখানেই মারা গেল ও। অপারেশনের দিন কয়েক বাদে। গত 19 শে জুলাই।

ওর চিকিৎসার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল ওর অগণিত বন্ধুবান্ধব। ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে গঠিত হয় বিশেষ 'চিকিৎসা সাবকমিটি'। বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও। ওর স্ত্রী সুপ্রিয়া কেন্দ্রীয় ডাক তার বিভাগে কাজ করে। তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। রণজিৎ ফিরে এল না।

প্রায় দশ বছর হল আমরা রণজিৎকে চিনি। গণবিজ্ঞানের কাজের সূত্রেই পরিচয়। —এবং বন্ধুত্ব। কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির কাজের সাথে যুক্ত ছিল রণজিৎ। ভীষণ সিরিয়াস ছিল কাজের ব্যাপারে। কাজ করত হাসি মুখে। ওকে বেজার দেখিনি আমরা কখনো। কাজ করত সকাল থেকে সন্ধ্যে। ইছাপুর থেকে বালী অবধি দৌড়ে। বাড়ি ছিল মৌরীগ্রাম। ফিরতে রাত হত। —ক্লান্ত হত না। এরকম মানুষের মৃত্যু—এত অল্প বয়সে—মনকে বড় বেশী নাড়া দেয়।

আমরা একজন ভাল বন্ধু হারালাম। ওর ছোট ছেলে, স্ত্রী, বাবা, মা ও ভাই—এঁরা হারালেন আরো অনেক কিছু। এখন সকলের স্মৃতি-চারণের পালা।

ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে রণজিতের স্মরণসভা আয়োজিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছে 'স্মৃতির ফুল'—রণজিতের শেষ কয়েকদিনে লেখা ডায়েরী নিয়ে। যারা রণজিতকে চিনতেন না বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

সঃ মঃ, বি-ও-বি

R. N. 34929/79
YEAR 13 NUMBER 1

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
B2 Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700074
July-Aug., 1989

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী : গত এক বছরে কি কি ছিল

জুলাই-আগস্ট 1988

☐ ☐ বাড়াবাড়ি—দুনিয়া জুড়ে ॥ রবীন চক্রবর্তী ☐ জনবিজ্ঞান : একটি নতুন জীবনচর্চা ॥ প্রদীপ দত্ত ☐ কারিগরী শিক্ষা : দিশার সন্ধানে ॥ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ইন্দিরা সাগর প্রকল্প—বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা ॥ CAISA ☐ 'উই লাভ ইউ ডিক' —প্রয়াত রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রতি। সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা জাগানোর প্রয়াস। চুঁচুড়ার বিজ্ঞান ক্লাবের বারো বছর ॥ ধ্রুবজ্যোতি দে ☐ সাপে কাটলে কি করবো : একটি বিতর্ক ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ ☐

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1988

☐ ☐ বি-ও-বি'র কথা—লঘু দ্রবণের জোরালো ক্ষমতা ☐ একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ॥ গৌতম ব্যানার্জী ☐ প্রসঙ্গ হোমিওপ্যাথি : পত্রিকা পরিচিতি ॥ র.ম. ☐ হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ সবুজ সম্ভাবনা (4) ॥ সুজয় মুখার্জী, সুমিত বিশ্বাস, সুরঞ্জন কর ☐ বুদ্ধিজীবীর দায়বদ্ধতা ॥ (অনুবাদ) সুভাষ গাঙ্গুলী ☐ বৌদ্ধিক কারখানা ক্রেসিডা : তালা এখনো খোলে নি ॥ বিশেষ প্রতিবেদক ☐ এবার বিকল্প নোবেল পুরস্কার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ॥ সৌমেন গুহ ☐ হোমিওপ্যাথি বিতর্ক : দ্বিতীয় পর্যায় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ চিঠিপত্র ☐ ☐

জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী 1989

☐ ☐ বি-ও-বি'র কথা—ভূপাল : এবার হোক মানবিক অধিকার ॥ সৌমেন গুহ ☐ রাজধানী 1988 : কলেরা মহামারী ॥ সুরঞ্জন কর ☐ কিসের আলয়—বিদ্যালয় ॥ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ টেলিভিশনে লোকবিজ্ঞান ॥ সন্ধানী ☐ সভ্য অন্ধবিশ্বাস : পরিচিতি ॥ সৌমেন গুহ ☐ হার্ট অ্যাটাকের সংকেত ॥ বিষ্ণুপদ জানা ☐ হার্ট অ্যাটাক মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন : কোথায় ও কেন ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ গ্রীন হাউস এফেক্ট : সাম্প্রতিক উদ্বেগ ॥ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ চাকদহ : পেপার মিলের ছোবল ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ সমীক্ষা ॥ চাকদহ সাইন্স ফোরাম ☐ মাছের মড়ক : একটি প্রতিবেদন ॥ এম. মণ্ডল ও জয়দেব জানা ☐ বই পরিচিতি ॥ সুনীশ দেব ☐ জানবার কথা ॥ সুশ্রুত ☐ নর্মদা বাঁধ : মানবিক অধিকারের লড়াই ॥ র.ম. ☐

মার্চ-জুন 1989

☐ ☐ ভূপাল : সমঝোতা না আত্মসমর্পণ ॥ অনিল সদ্গোপাল ও সুজিত দাস ☐ "জল বাঁচাও জীবন বাঁচাও" ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ও মৌসুমী ভৌমিক ☐ সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : জাতীয় ঐক্য ও অশোকস্তম্ভ ॥ সৌমেন গুহ ☐ খাদ্যে ভেজাল : একটি পর্যালোচনা ॥ সুস্মিতা ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ এ দেশে এইড্স মহামারী হবে কি ॥ পাচু রায় ☐ মনের সমস্যা : আমরা কি কিছুই করতে পারি না ॥ সুখময় ভট্টাচার্য ☐ জনবিজ্ঞান কংগ্রেস 1989. ॥ বিশেষ প্রতিবেদক ☐ একটি আকর্ষণীয় আলোচনাচক্র ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ভারতে গবেষণাগারের ব্যাধি ॥ নিখিলেশ, দেবাশিস ☐ বই পরিচিতি : ঘূর্ণীঝড়ের রাজনীতি ॥ লতিকা গুহ ☐ উৎস মানুষের 'আড্ডা' ॥ নিলয় রায় ☐ 'গণদর্পণ' সমাচার ॥ প্রতিবেদক ☐ ☐

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18 ভুবন ধর লেন, কলি-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত